হযরত আলীর (আ.) শ্রেষ্ঠত্বের বিশটি দলিল

মূলঃ
হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন
শেইখ ড. আব্দুল্লাহ আহমাদ আল ইউসুফ

ভাষান্তরঃ
হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন
আল-হাজ্ব মাওলানা মো. আলী মোর্ত্তজা

আল্লাহর নামে শুরু করছি
যিনি রহমান (পরম করুণাময়)
যিনি রহিম (অসীম দয়াবান)

হযরত আলীর (আ.) শ্রেষ্ঠত্বের বিশটি দলিল

মূলঃ
হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন
শেইখ ড. আব্দুল্লাহ আহমাদ আল ইউসুফ

ভাষান্তরঃ
হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন
আল-হাজ্ব মাওলানা মো. আলী মোর্ত্তজা

গ্রন্থ পরিচিতি

হযরত আলীর (আ.) শ্রেষ্ঠত্বের বিশটি দলিল

মূল	: হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন শেইখ ড. আব্দুল্লাহ আহমাদ আল ইউসুফ
ভাষান্তর	: হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন আল-হাজ্ব মাওলানা মো. আলী মোর্ত্তজা
সম্পাদনা	: মো. আলী রেজা
প্রকাশক	: আসকারী হোসাইন
প্রকাশকাল	: শাওয়াল ১৪৪৪ হি., এপ্রিল ২০২৩ ইং বৈশাখ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ	: জাহিদুর রহমান
মুদ্রণ	: আল হেরা
কপি	: ১০০০
পৃষ্ঠা সংখ্যা	: ৭০
বিক্রয় মূল্য	: ১১৫ টাকা

প্রকাশনা সংস্থা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

Twenty proofs of the excellence of Hazrat Ali (a.s.).

Writtne by Hujjatul Islam wal Muslimin Dr. Abdullah Ahmad Al yousuf, Translated in Bangali by Hujjatul Islam wal Muslimin Al-Hajj Mulana Md. Ali Murtaza
Edited by Md. Ali Reza

উৎসর্গ

এই পুস্তিকাটি সর্ব প্রথম যুগের ইমাম মহাকালের ত্রাণকর্তা হযরত হুজ্জাত ইবনিল হাসান ইমাম মাহদীর (আ.) খেদমতে হাদিয়া করছি। অতঃপর তার দয়ার মাধ্যমে সকল শহীদ ও সৎকর্মশীলদের এবং হযরত আলীর বেলায়াত তথা ইমামতের পথে সকল নিবেদিত প্রাণ এবং সকল শহীদদের পবিত্র আত্মার প্রতি উৎসর্গ করছি।

সূচীপত্র

অনুবাদকের কথা	০৯
লেখকের কথা	১২
হযরত আলীর ২০টি অনন্য বৈশিষ্ট্য	১৬
১। সর্বপ্রথম মুসলমান	১৬
২। মহানবী হযরত মুহাম্মাদের (সা.) সাথে সর্বপ্রথম নামাজ আদায়কারী	২১
৩। মহানবী হযরত মুহাম্মাদের (সা.) সর্বপ্রথম ছাত্র	২৪
৪। সর্বপ্রথম ওহী লেখক (কাতেবে ওহী)	২৬
৫। পবিত্র কোরআনের সর্বপ্রথম সংকলকারী	২৭
৬। মহানবী হযরত মুহাম্মাদের (সা.) হাতে সর্বপ্রথম বায়াতকারী	৩২
৭। মহানবী হযরত মুহাম্মাদের (সা.) সর্বপ্রথম ওয়াসী	৩৪
৮। ইসলামের সর্বপ্রথম ইমাম	৩৭
৯। ইসলামের সর্বপ্রথম আমিরুল মুমিনিন	৩৮
১০। ইসলামের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মত্যাগী	৩৯
১১। আল্লাহর পথের সর্বপ্রথম মুজাহিদ	৪৩
১২। ইসলামের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক	৪৪
১৩। ইসলামের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি	৪৬
১৪। ইসলামের সর্বপ্রথম হাশেমী খলিফা	৪৯
১৫। ইসলামের সর্বপ্রথম লেখক	৪৯
১৬। আরবী ব্যকরণের জনক	৫০
১৭। ইলমের কালামের (কালামশাস্ত্রের) জনক ও প্রতিষ্ঠাতা	৫৫
১৮। ইসলামী হুকুমত তথা শাসনব্যবস্থার জনক ও প্রতিষ্ঠাতা	৫৬
১৯। ইসলামের সর্বপ্রথম মুর্তি ধ্বংসকারী (বুতশেকান)	৫৯
২০। কাবা ঘরে জন্ম এবং মসজিদে শাহাদাত প্রাপ্ত হওয়ার মর্যাদার অধিকারী	৬৫
শেষ কথা	৬৬
সত্যসূত্র	৬৭

অনুবাদকের কথা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদের (সা.) পর হযরত আলীর (আ.) চেয়ে উত্তম ব্যক্তি তো নাই-ই বরং নবীর উম্মতের মধ্যে এমন কেউ নেই যে অনুরূপ মর্যাদায় আলীর (আ.) নিকটবর্তী হতে পারে। হযরত আলীর (আ.) মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবাগণ হতে যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা অন্যান্য সকল সাহাবার মর্যাদায় বর্ণিত হাদীসের তুলনায় অধিক। যদিও শুধু ক্ষমতার জোরেই অনেক সত্যকে দমিয়ে রাখা হয়েছে যুগ যুগ ধরে। রাজনীতির ধ্বংসাত্মক হাত যতদূর সম্ভব হয়েছে তার মর্যাদাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে এবং নিজের অবস্থানকে রক্ষা করার জন্য তাঁর (আলীর) সম্পর্কে কুৎসা পর্যন্ত রটনা করেছে। তারপরেও তার মর্যাদা এত অধিক যে, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল বলেন: রাসূলের (সা.) সাহাবাগণের মধ্যে অন্য কারো সম্পর্কে হযরত আলীর (আ.) মত এত অধিক মর্যাদা বর্ণিত হয়নি।[১]

জনৈক ব্যক্তি ইবনে আব্বাসের উপস্থিতিতে বলল: সুবহানাল্লাহ! হযরত আলীর (আ.) মর্যাদায় বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এত অধিক যে, আমার ধারণা তা তিন হাজারের মত হবে। ইবনে আব্বাস বললেন: কেন তুমি বললে না যে, হযরত আলীর মর্যাদায় বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ত্রিশ হাজারের কাছাকাছি।[২]

ইবনে হাজার তার সাওয়ায়েক নামক গ্রন্থে লিখেছেন: আলীর (আ.) শানে (সম্পর্কে) যত কোরআনের আয়াত নাজিল হয়েছে, অন্য কোন ব্যক্তির শানে এত পরিমাণ আয়াত নাজিল হয়নি।[৩]

তার ফযিলত ও মর্যাদা সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (সা.) থেকে বর্ণিত অসংখ্য হাদীসের মধ্যে অল্প কিছু হাদীস নিম্নে আলোচনা করা করব। যা তাকে মুসলমানদের নেতা এবং রাসূলের (সা.) স্থলাভিষিক্ত হওয়ার যোগ্যতা দান করেছে:

রাসূল (সা.) হযরত আলীর (আ.) কাঁধে হাত রেখে বলেছেন:

هذا إمام البررة قاتل الفجرة منصور من نصره مخذول من خذله

এই আলী সৎ কর্মশীলদের ইমাম, অন্যায়কারীদের হন্তা, যে তাকে সাহায্য করবে সে সাফল্য লাভ করবে (সাহায্য প্রাপ্ত হবে) এবং যে তাকে হীন করার চেষ্টা করবে সে নিজেই হীন হবে।

হাদীসটি হাকিম নিশাবুরী তাঁর 'মুসতাদরাক' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১২৯ পৃষ্ঠায়

১। মুনতাহাল আমাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২০ ও তারিখে হাবিবুস সাঈর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪১১।

২। সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩০৯।

৩। ইমতাউল আসমা, পৃষ্ঠা-৫১০।

জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ আনসারী হতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন: এই হাদীসটি সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে তদুপরি বুখারী ও মুসলিম তা বর্ণনা করেন নি।

রাসূল (সা.) বলেছেন: আলী সম্পর্কে আমার প্রতি তিনটি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে:

إنَّه سيّد الْمسلمين و إمام الْمتّقين و قائد الغر الْمحجلين

নিশ্চয়ই সে মুসলমানদের নেতা, মুত্তাকীদের ইমাম এবং নূরানী ও শুভ্র মুখমণ্ডলের অধিকারীদের সর্দার।

হাকিম তাঁর 'মুসতাদরাক' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১৩৮ পৃষ্ঠায় হাদীসটি এনেছেন ও বলেছেন: হাদীসটি সনদের দিক হতে বিশুদ্ধ কিন্তু বুখারী ও মুসলিম তা বর্ণনা করেন নি।

একদিন রাসূল (সা.) ঘোষণা করলেন: প্রথম যে ব্যক্তি এ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করবে সে মুত্তাকীদের ইমাম, মুসলমানদের নেতা, দীনের মধুমক্ষিকা (সংরক্ষণকারী), সর্বশেষ নবীর প্রতিনিধি ও উজ্জ্বল মুখমণ্ডলের অধিকারীদের সর্দার। তখন আলী ঐ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করলে রাসূল (সা.) তাঁকে এ সুসংবাদ দানের উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কোলাকুলি করলেন ও তাঁর কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন: তুমি আমার ঋণ পরিশোধ করবে, আমার বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দেবে, যে বিষয়ে তারা মতদ্বৈততা করবে তুমি তা ব্যাখ্যা করে বোঝাবে।

রাসূল (সা.) বলেছেন:

يا علي أخصمك بالنّبوة فلا نبوة بعدي و تخصم النّاس بسبع أنت أولهم إيْمانا بالله و أوفاهم بعهد الله و أقسمهم بالسوية و أعدلهم في الرعية و أعظمهم عند الله مزية

হে আলী! তোমার ওপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব হলো নবুওয়াতের কারণে এবং আমার পরে কোন নবী ও রাসূল নেই। আর সকল মানুষের ওপর তোমর সাতটি শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে,তুমি সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে ঈমান এনেছ,তুমি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রক্ষার ক্ষেত্রে সবার চেয়ে অগ্রগামী,তুমি সকল মানুষ হতে প্রত্যয়ী এবং আল্লাহর নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে সবার হতে অগ্রগামী,বায়তুল মাল বণ্টনে সর্বাধিক সমতা রক্ষাকারী, বিচার ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সকল হতে ন্যায় বিচারক,আল্লাহর নিকট সম্মানের ক্ষেত্রে সকলের চেয়ে নৈকট্যের অধিকারী।

আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা.) বলেছেন: হে আলী! সাতটি বৈশিষ্ট্যের কারণে তুমি অন্যদের হতে শ্রেষ্ঠ, তুমি সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী, তাঁর প্রতি প্রতিশ্রুতি পালনকারী, তাঁর নির্দেশের ক্ষেত্রে সর্বাধিক দৃঢ়, জনগণের

প্রতি সবচেয়ে দয়ালু, বিচারের ক্ষেত্রে পারদর্শী এবং জ্ঞান, বিদ্যা, দয়া, উদারতা ও সাহসিকতা ইত্যাদি যাবতীয় সৎ গুণের ক্ষেত্রে অন্য সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম।

অত্র গ্রন্থটি হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন শেইখ ড. আব্দুল্লাহ আহমাদ আল ইউসুফ আরবী ভাষায় লিখেছেন এবং তা উর্দু ভাষায় চমৎকারভাবে অনুবাদ করেছেন হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন শেইখ আসকারী হোসাইন। আর আমি গ্রন্থটিকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। আশাকরি এই মূল্যবাণ গ্রন্থটি প্রতিটি সত্যন্বেষী মানুষের হেদায়াতের পথের দিশারী হিসাবে কাজ করবে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সকলকে তাঁর সঠিক পথে পরিচলাতি হওয়ার তাওফিক দান করুন এবং পবিত্র আহলে বাইতের বিশেষ করে হযরত আলীর মারেফাত অর্জন ও তাঁর আনুগত্য করার সৌভাগ্য দান করুন।

الحمدللّٰه رب العالمين و صلواته على محمد و آله الطاهرين

মো. আলী মোর্ত্তজা

০৫/০৪/২০২৩

লেখকের কথা

ইতিহাস ও হাদিসের অসংখ্য গ্রন্থ থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আলী (আ.) সর্বপ্রথম মুসলমান। তিনি অগ্রগামী মুসলমান এবং রাসূলের (সা.) রেসালাতের শুরু থেকেই তিনি তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম রাসূলের (সা.) পিছনে নামাজ আদায় করেন এবং মহানবীর সকল দুঃখ ও সুখের সাথী হিসাবে থাকাই হচ্ছে হযরত আলীর গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার অন্যতম কারণ।

সকল মুসলমানদের উপর হযরত আলীর শ্রেষ্ঠত্ব এবং সর্বপ্রথম মুসলমান হওয়ার বিষয়টি পবিত্র কোরআনের এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যেখানে মহান আল্লাহ মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারীদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রসর হয়েছে এবং যারা নিষ্ঠা ও সততার সাথে তাদেরকে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট, আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন, জান্নাত বা বেহেশতী কুঞ্জকানন, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে এটাই মহা সাফল্য।[১]

হযরত খাদিজা ছিলেন প্রথম নারী যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং নিদারুণ কষ্টের মধ্যেও তিনি সবসময় ইসলাম ও আল্লাহর রাসূলের পাশে থাকেন। হযরত আলী বিন আবু তালেব (আ.)ও প্রথম পুরুষ মুসলমান। তিনিও সর্বাবস্থায় রাসূলে খোদার (সা.) পাশে ছিলেন এবং হিজরতের রাতে নিজের জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও তিনি শত্রুদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য নবীজির বিছানায় চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকেন।

যেহেতু হযরত আলী (আ.) সর্বপ্রথম ঈমান এনেছিলেন এবং রাসুলের (সা.) সকল দুঃখ ও কষ্টের সময়ে সাথে ছিলেন সুতরাং এই আয়াতের ভিত্তিতে ইমাম আলী (আ.) সকল মুসলমানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

আমিরুল মুমিনিন হযরত আলীর (আ.) জীবনী অধ্যায়ন করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি দ্বীন ইসলামের সকল ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী, তিনিই সর্বপ্রথম রাসূলের (সা.) পিছনে নামাজ আদায়কারী। তিনিই ইসলামের সর্বপ্রথম ইমাম। তিনিই সর্বপ্রথম আমিরুল মুমিনিন উপাধি পেয়েছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম কোরআন সংকলন করেন এবং তিনিই হচ্ছেন

৪। সূরা তাওবা, আয়াত - ১০০।

উলুমে কোরআন তথা কোরআনিক বিজ্ঞানের জনক। তিনিই রাসূলের (সা.) সর্বপ্রথম ছাত্র এবং তিনিই রাসূলের হাতে সর্বপ্রথম বায়াত করেন এবং তাঁর সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি সর্বপ্রথম ওহী লেখক। তাঁর বেলায়াত তথা ইমামতকে সবার উপর ফরজ করা হয়েছে। তিনিই সর্বপ্রথম রাসুলের জন্য ত্যাগস্বীকার করেছেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম জিহাদ করেছেন। তিনিই ছিলেন ইসলামের প্রথম সেনাপতি এবং তিনিহি ছিলেন ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগ। তিনিই ইসলামের প্রথম বিচারক এবং তিনিই প্রথম শাসক। তিনিই বনি হাশিমের প্রথম খলিফা এবং তিনিই সর্বপ্রথম আইন প্রনেতা। মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম লেখক তিনিই। তিনিই আরবি ব্যকরণের জনক। তিনিই কালামশাস্ত্রে জনক। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যার জন্ম কাবা ঘরে হয়েছে আর শাহাদাত হয়েছে মসজিদের ভিতরে। সুতরাং হযরত আলীর (আ.) শ্রেষ্ঠত্বের পাল্লা অনেক বড় এবং অনেক ভারী।

আর একারণেই সকল আলেম, পণ্ডিত, চিন্তাবিদ, লেখক এবং ঐতিহাসিকগণ একমত যে হযরত আলীর (আ.) ব্যক্তিত্ব অনন্য এবং তার সাথে কারও তুলনা চলে না।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বারংবার হযরত আলীর মর্যাদা বর্ণনা করতেন এবং আলেম ও মুহাদ্দিসগণও স্বতন্ত্রভাবে এমন গ্রন্থ লিখেছেন যার মধ্যে শুধুমাত্র হযরত আলীর ফজিলত ও মর্যাদার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। আর এই সকল লেখনি শুধুমাত্র কোন একটি বিশেষ ধর্ম বা মাযহাবের অনুসারীরাই লেখে নি বরং সকল ধর্ম ও মাযহাবের পণ্ডিতরা হযরত আলীর (আ.) ফজিলতের উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন: নাসাঈর লেখা খাসায়েসে আমিরুল মুমিনিন গ্রন্থ। খারাজমীর মানকিব গ্রন্থ, ইস্পহানির মানাকিবে আলী ইবনে আবি তালিব (আবু বকর আহমাদ বিন মুসা বিন মারদুইয়া ইস্পাহানি), ইবনে শাহরে আশুবের মানাকিবে আলে আবি তালিব গ্রন্থ ইত্যাদি। এগুলো হচ্ছে সেই সকল গ্রন্থ যা শুধুমাত্র হযরত আলীর ফজিলতের উপর অথবা বেশীরভাগই তাঁর ফজিলতের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

আর আল্লাহর অশেষ রহমতে প্রতিটি যুগেই এমন কিছু মুহাদ্দিস, পণ্ডিত ও গবেষক ছিলেন যারা হযরত আলীর (আ.) ফজিলতের উপর গ্রন্থ লিখেছেন এবং তা জনগণের কাছে পৌছে দিয়েছেন। যদিও অনেক সময় হযরত আলীর ফজিলত লিখা এবং প্রচার করার অপরাধে তাদেরকে অনেক নির্যাতন ও জুলেমের শিকার হতে হয়েছে এমনকি অনেকে এই পথে শাহাদা বরণও করেছেন।

অপরদিকে হযরত আলীর (আ.) দুশমনরা অনেক চেষ্টা করেও হযরত আলীর ফজিলতেকে গোপন রাখতে পারে নি। বরং যত সময় পেরিয়েছে ততই মাওলার ফজিলত বেশী বেশী মানুষের মাঝে প্রচার হয়েছে। যেভাবে ইবনে আবিল হাদিদ বলেছেন: আমি এই মহান ব্যক্তির ফজিলতের বিষয়ে আর কি বলব যার শত্রুরাও তাঁর প্রশংসা করেছে এবং তাঁর ফজিলতের কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। তারা তাঁর ফজিলত অস্বীকারও করতে পারে নি এবং গোপনও করতে পারে নি। আমি তাঁর ব্যপারে কি বলব যার দরবারে ফজিলত নিজেই সিজদা করে। যার ফজিলতের কথা সকল মাযহাবের লোকেরা স্বীকার করেছে এবং সকলেই তাঁর ফজিলতে আকৃষ্ট হয়েছে। তিনি হলেন সকল ফজিলতের সরদার এবং সকল মর্যাদার উৎস। (শারহে নাহজুল বালাগা, ইবনে আবিল হাদিদ ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৫)

হযরত আলীর (আ.) যত ফজিলত ও মযাদা বর্ণনা করা হয়েছে মহানবী হযরত মুহাম্মাদের (সা.) অন্য কোন সাহাবার এমন ফজিলত ও মর্যাদা বর্ণনা করা হয় নি। হযরত আলী (আ.) এমন এক উজ্জ্বল হকিকত যার ফজিলত সকল মোহাদ্দিস, ঐতিহাসিক এবং পণ্ডিতগণ স্বীকার করেছেন। আর সেই সকল মর্যাদা ও ফজিলতকে মুতাওয়াতির ও সহীহ সুত্রে বর্ণনা করেছেন।

অত্র গ্রন্থে হযরত আলীর (আ.) এমন বিশটি ফজিলত ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যা তাঁর পূর্বে আর কারও মধ্যে ছিল না। আর এই ফজিলতসমূহ সর্বপ্রথম তাঁর মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। যা থেকে প্রমাণিত হয়ে যে তিনি ইসলামী কাফেলার বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে সকল মুসলমানের উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখতেন।

আমরা এই পুস্তিকায় নতুন প্রজন্ম এবং তুরুণ সমাজকে মাওলায়ে কায়েনাত হযরত আলী ইবনে আবি তালিবের (আ.) ফজিলত সম্পর্কে পরিচিত করানোর জন্য অতি সহজ ও সাবলিল ভাষায় হযরত আলীর ফজিলত বর্ণনা করেছি। আর এই ফজিলতসমূহ শিয়া-সুন্নি সকল মাযহাবের গ্রন্থে মুতাওয়াতির ভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর এই ফজিলতসমূহ সকল মুসলামনের উপর হযরত আলীর (আ.) শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণ করে।

আল্লাহর দরবারে আমার আকুল আবেদন তিনি যেন এই গ্রন্থটিকে আমার আমলনামার সৌন্দর্য হিসাবে উপস্থাপন করেন।

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না। কেবল (সাফল্য লাভ করবে) সে ব্যক্তি যে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহর নিকট আসবে।[১]

হে আল্লাহ! আমার এই লেখনিকে কিয়ামতের দিন আমার নাজাত ও মুক্তির উপায় হিসাবে নির্ধারণ করুন। নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহই সকল আশা ও রহমত এবং বরকতের চূড়ান্ত মালিক।

আল্লাহুল মুস্তায়ান
আব্দুল্লাহ আহমাদ আল ইউসুফ
মঙ্গলবার ২৫ রবিউস সানি ১৪৩৫ হিজরি
২৫ শে ফেব্রুয়ারী ২০১৪

৫। সূরা শুয়ারা, অধয়াত -৮৮, ৮৯।

মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি

হযরত আলীর ২০টি অনন্য বৈশিষ্ট্য

১। সর্বপ্রথম মুসলমান

সকল বিখ্যাত ও বিশিষ্ট ঐতিহাসিকগণ ঐকমত্য পোষণ করেন যে, হযরত আলী (আ.) হলেন সর্বপ্রথম মুসলমান এবং তাঁর পূর্বে কেউ ইসলাম গ্রহণ করে নি। এই বিষয়টি হযরত আলী (আ.) নিজেই গুরত্বসহকারে বলেছেন:

انا اول مسلم و اول من صلى مع رسول الله

হে আল্লাহ! আমি সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে আপনার দরবারে সিজদা করেছে এবং আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে আপনার রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে (লাব্বাইক বলেছে)।[১]

ইবনে মারদুইয়া হযরত আলী (আ.) থেকে বর্ণনা করেছেন:

انا اول مسلم و اول من صلى مع رسول الله

আমি সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহ দরবারে সিজদা করেছে এবং আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহর রাসূলের (সা.) আহ্বানে সাড়া দিয়েছে (লাব্বাইক বলেছে)।[২]

ইবনে হিশাম তার সিরাতুন নাবাভিয়া গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন: হযরত আলীর প্রতি আল্লাহর বিশেষ রহমত ও দয়াসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে, যখন মক্কায় সংকট তথা দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয় তখন হযরত আবু তালিবও অনেকগুলো সন্তান নিয়ে বেশ সমস্যায় পড়ে যান। তখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তার চাচা আব্বাসের (যার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল) কাছে গিয়ে বললেন: দুর্ভিক্ষের কারণে মানুষ কষ্টে আছে এবং আপনার ভাই আবু তালিবের অনেক সন্তান এবং তার পরিবারও অনেক বড় সে জন্য তিনিও অনেক কষ্টে আছেন। কাজেই আমরা সকলে মিলে তার বোঝা কিছুটা হালকা করতে পারি। তার এক সন্তানের দায়িত্ব আমি নেই আর এক সন্তানের দায়িত্ব আপনি গ্রহন করুন। এভাবে তার উপর থেকে পরিবারের বোঝা কিছুটা কমে যাবে। জনাব আব্বাস বললেন হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। জনাব আব্বাস এবং রাসূল (সা.) হযরত আবু তালিবের কাছে গেলেন এবং বললেন: আমরা আপনার উপর থেকে পরিবারের কিছুটা বোঝা কমাতে চাই, এ ব্যপারে আপনি কি বলেন?

জনাব আবু তালিব বললেন: আকিল ব্যতীত অন্য সন্তানদের মধ্য থেকে যাকে

৬। বিহারুল আনওয়ার, আল্লামা মাজলিসি, খণ্ড ৩৪, পৃ: ১১১।

৭। মানিকিবে আলী ইবনে আবি তালিব, ইবনে মারদুইয়া ইস্পহানি, পৃ: ৪৭, হা. ১।

ইচ্ছা নিয়ে গেলে তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। তখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) হযরত আলীকে এবং জনাব আব্বাস হযরত জাফরকে নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিলেন। আর এর পর থেকে হযরত আলী (আ.) সর্বদা মহানবী হযরত মুহাম্মাদের (সা.) সাথেই ছিলেন। মহানবীর বেছাতের (নবুয়্যত ঘোষণার) পর তাঁর প্রতি ঈমান আনেন, তাঁর রিসালাতের স্বীকৃতি দেন এবং সর্বদা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেন।[১]

وكان مما أنعم الله [به] على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الاسلام.

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج قال: كان من نعمة الله على علي بن أبي طالب، ومما صنع الله له، وأراده به من الخير، أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة ، وكان أبو طالب ذا عيال كثير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس عمه، وكان من أيسر بنى هاشم:

يا عباس، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة ، فانطلق بنا إليه فلنخفف [عنه] من عياله، آخذ من بنيه رجلا وتأخذ أنت رجلا فنكفلهما عنه، فقال العباس: نعم. فانطلقا حتى أتيا أبا طالب، فقالا له: إنا نريد أن نخفف [عنك] من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه، فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما عقيلا فاصنعا ما شئتما – قال ابن هشام: ويقال عقيلا وطالبا.

فأخذ رسول صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه، وأخذ العباس جعفرا فضمه إليه، فلم يزل على مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله تبارك وتعالى نبيا، فاتبعه على رضي الله عنه، وآمن به وصدقه، ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستغنى عنه.

নাসাঈ তার খাসায়েস গন্থে যাইদ বিন আরকাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদের উপর সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি ঈমান এনেছেন তিনি হলেন আলী ইবনে আবি তালিব।

اول من اسلم مع رسول الله (ص) على ابن ابى طالب.

রাসূলের (সা.) উপর সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি ঈমান এনেছেন তিনি হলেন আলী

৮। সিরাতুন নাবাভিয়া, ইবনে হিশাম, খণ্ড ১, পৃ: ১৮৫।

ইবনে আবি তালিব।[১]

অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণ বলেছেন যে, হযরত আলী ইবনে আবি তালিব সর্ব প্রথম ব্যক্তি যিনি মাহাবরীর রেসালাতের উপর ঈমান এনেছেন এবং তাঁর অনুসরণ করেছেন। আর এই দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত মত পোষণকারী লোকের সংখ্যা খুবই নগন্য। এসম্পর্কে হযরত আলী (আ.) নিজেও বলেছেন, আমিই সিদ্দিকে আকবার, আমিই ফারুকে আযাম, আমিই সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী এবং আমিই সর্বপ্রথম মহানবীর সাথে নামাজ আদায় করেছি।

ঐতিহাসিক গ্রন্থ অধ্যায়ন করলেও বিষয়টি পানির মত স্পষ্ট হয়ে যায়। ওয়াকেদী এবং ইবনে জারির তাবারির মত বড় বড় আলেমদের দৃষ্টিভঙ্গিও একই। আর আল ইসতিয়াব গ্রন্তের লেখকও (আবু আমরু ইফসুফ বিন আব্দুল্লাহ নামরি, ইবনে আব্দুল বার নামে পরিচিত) একই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন।

ইবনে আছির (عز الدين ابن اثير) তার উসদুল গাব্বাহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মত অনুযায়ী হযরত আলী ইবনে আবি তালিব হচ্ছেন মর্বপ্রথম মুসলমান।

و فى اسد الغابه : هو اول الناس اسلاما فى قول كثيرا من العلماء

অধিাংশ আলেমগণের মতে হযরত আলী ইবনে আবি তালিব হচ্ছেন সর্বপ্রথম মুসলমান।

ইবনে আব্দুল বার তার ইস্তিয়াব গ্রন্থে লিখেছেন, সালামন, আবুযার, মেকদাদ, জাবের, খাব্বাব, আবু সাইদ খুদরি এবং যাইদ বিন আরকাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আলী (আ.) হলেন সর্বপ্রথম মুসলমান এবং তিনিই সকল মুসলমানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

ইবনে ইসহাক বলেন: পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি আল্লাহর একত্ববাদের এবং মহানবীর রেসলাতের স্বীকৃতি দিয়েছেন তিনি হলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব।

ইবনে শাহাবের মত অনুযায়ী হযরত খাদিজার পর পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিলেন তিনি হলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব। তবে এটা সকলে স্বীকার করে যে, সর্বপ্রথম যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তিনি হলেন হযরত খাদিজাতুল কোবরা। ইবনে শাহাব জনাব ইবনে আব্বাস থেকে

৯। খাসায়েসে আমিরুল মুমিনিন আলী ইবনে আবি তালিব, নাসাঈ; পৃ: ২০ হা. ৪।

বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলীর মধ্যে এমন চারটি বিশেষ বৈশিষ্ট রয়েছে যা অন্য কারও মধ্যে নেই।

১। আরব এবং অনারবদের মধ্যে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি মহানবীর (সা.) পিছনে নামাজ আদায় করেছেন তিনি হলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব।

২। মহানবী হযরত মুহাম্মাদের (সা.) সকল যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব।

৩। ওহুদের যুদ্ধে যখন সকলেই মহানবীকে একা ফেলে চলে গিয়েছিল তখন হযরত আলী (আ.) নিজের জীবন বাজি রেখে রাসুলের (সা.) সাথে ছিলেন এবং তাকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।

৪। মহানবীর (সা.) মৃত্যুর পর তাঁর গোসল দেয়া, কাফন পরানো এবং দাফনের কাজটিও হযরত আলীই করেছিলেন।

ইবনে ইসহাক হযরত সালমান ফার্সি ফেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা.) বলেছেন: কিয়ামতের দিন হাউজে কাউছারে সর্বপ্রথম আমার সাথে সাক্ষাত করবে উম্মতের সর্বপ্রথম মুসলমান হযরত আলী ইবনে আবি তালিব। এই হাদিসটি হযরত সালমান থেকে হাকিম নিশাপুরিও তার মুস্তাদরাক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর ইস্তিয়াব গ্রন্থের লেখক ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন: হযরত খাদিজার পর হযরত আলীই সর্বপ্রথম রাসূলের (সা.) পিছনে নামাজ আদায় করেছেন। একই গ্রন্থে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত খাদিজার পর সর্বপ্রথম ব্যক্তি হযরত আলী (আ.) যিনি মহানবীর পিছনে নামাজ আদায় করেছেন।

আবু আমরু এবং ইবনে আব্দুল বার বলেন: হাদিসের সনদ সহীহ এবং নির্ভরযোগ্য। সুতরাং এই হাদিসের রাবিদের কোন ত্রুটি ধরার সুযোগ নেই। ইবনে শাহাব, আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আকিল, কাতাদাহ এবং ইবনে ইসহাক বলেন: পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তি হলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব। সকল মুহাদ্দিসগণ একমত পোষণ করেন যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপর সর্বপ্রথম হযরত খাদিজা এবং তারপর হযরত আলী ইবনে আবি তালিব ঈমান এনেছিলেন। ইবনে আব্দুল বার বলেন: এই হাদিসটি আবু রাফে থেকেও বর্ণিত হয়েছে। আর আবু রাফের সুত্র থেকে ইবনে আব্দুল বার বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মাদ বিন কাব আল কারজির কাছে প্রশ্ন করা হল সর্বপ্রথম হযরত আলী ঈমান এনেছিলেন নাকি আবু বকর? তিনি উত্তরে বলেন: কি বল, নিশ্চয়ই হযরত আলী ইবনে আবি তালিব হলেন সর্বপ্রথম মুসলমান আর এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

ইবনে আব্দুল বার কাতাদা এবং হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সর্বপ্রথম মুসলমান হলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব। ইবনে ইসহাক বলেন: পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাসূলের (সা.) উপর ঈমান এনেছিলেন। এছাড়াও কাতাদাহ, হাসান এবং আরও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত খাদিজার পর সর্বপ্রথম মুসলমান হলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব। আর ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে: সর্বপ্রথম মুসলমান হলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব।

ইবনে আব্দুল বার মোসলেম মোল্লায়ী থেকে আনাস বিন মালিকের হাদিস বর্ণনা করেন যে, সোমবারে রাসূলের (সা.) বে'ছাত (নবুয়্যতের ঘোষণা) হয় আর মঙ্গলবারে হযরত আলী (আ.) তাঁর পিছনে নামাজ আদায় করেন। হাকিম মুস্তাদরাক গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদা এবং সে তার পিতার থেকে বর্ণনা করেন যে, সোমবারে রাসূলের (সা.) উপর প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয় এবং মঙ্গলবার হযরত আলী তাঁর পিছনে নামাজ আদায় করেন। এছাড়াও হাকিম আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সোমবার রাসূলের (সা.) নবুয়্যত ঘোষিত হয় এবং হযতর আলী (আ.) মঙ্গলবার তাঁর প্রতি ঈমান আনেন।

নাসাঈ তার খাসায়েস গ্রন্থে বিভিন্ন সনদে যাইদ বিন আরকাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদের (সা.) পিছনে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করেছেন তিনি হলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব। যাইদ বিন আরকামের দ্বিতীয় হাদিসে বলা হয়েছে হযরত আলী ইবনে আবি তালিব হলেন সর্বপ্রথম মুমলমান। হাকিম নিশাপুরি মুস্তাদরাক গ্রন্থে যাইদ বিন আরকামের হাদিস সংশোধন করে বলেন, হযরত আলীই (আ.) হচ্ছেন সর্বপ্রথম মুসলমান। যাহাবি মুস্তাদরাখের তালখিসে এবং ইবনে আব্দুল বার ইস্তিয়াব গ্রন্থে এই হাদিসকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। [১]

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন যে, পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম আল্লাহর রাসূলের (সা.) প্রতি ঈমান আনয়নকারী, সর্বপ্রথম তাঁর পিছনে নামাজ আদায়কারী এবং আল্লাহর দ্বীনকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণকারী ব্যক্তি হলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব। যদিও তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১০ বছর। আর হযরত আলী ইবনে আবি তালিবের প্রতি আল্লাহর সব থেকে বড় নেয়ামত এটাই ছিল যে, তিনি ইসলাম আসার আগে থেকেই রাসূলের (সা.) কোলে-পিঠে লালিত-পালিত

১০। আইয়ানুশ শিয়া, সাইয়্যেদ মোহসেন আমিন, খণ্ড ২, পৃ: ২৫, ২৬।

হয়েছেন।[১]

ইবনে ইসহাক লিখেছেন: হযরত আলী (আ.) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তার বয়স ছিল বিশ বছর।[২]

ইবনে কাছির স্বীয় সনদে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলীই ছিলেন সর্বপ্রথম মুসলমান। আর তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৯ বছর।[৩]

ইবনে আছির বিভিন্ন সনদে ইবনে আব্বাস এবং যাইদ বিন আরকাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আ.) হচ্ছেন সর্বপ্রথম মুসলমান।[৪]

উবাই বিন আরকাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহর (সা.) উপর সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তি হলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব।[৫]

কাজি মাগরেবি বলেন: হযরত আলী (আ.) আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের উপর তখন ঈমান এনেছিলেন যখন সবাই মুশরিক ছিল এবং তিনি মহানবীকে তখন স্বীকৃতি দিয়েছেন যখন সকলেই তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত। হযরত আলী হলেন সর্বপ্রথম মু'মিনি এবং সর্বপ্রথম মুসলমান। তিনি ছিলেন মুকাররাবিন (নৈকট্যপ্রাপ্ত) এবং সিদ্দিকিনদের (সত্যবাদী) অন্তর্ভূক্ত। আর এটা একমাত্র তারই অধিকার যে তাকে মুকাররাব এবং সিদ্দিক নামে ডাকা হোক। আর একারণেই বলা হয় যে, কোরআনের যে সকল আয়াতে হে ঈমানদারগণ! বলা হয়েছে তার প্রথম দৃষ্টান্ত হলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আ.)।[৬]

ইতিহাস, সিরাত এবং হাদিসের সকল বড় বড় গ্রন্থে লিখিত আছে যে, হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আ.) হচ্ছেন সর্বপ্রথম মুসলমান। আর এই মর্যাদায় কেওই তাঁর থেকে অগ্রগামী হতে পারে নি। আর হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন ঐতিহাসিক ছাড়া কেওই এই বিষয়কে অস্বীকার করতে পারে নি।

২। মহানবী হযরত মুহাম্মাদের (সা.) সাথে সর্বপ্রথম নামাজ আদায়কারী

হযরত আলীর (আ.) ফজিলত এবং অন্যদের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের দ্বিতীয়

১১। মানাকিবে, মুওয়াফফাক খারাজমি, পৃ: ৫১, হা. ১৩।

১২। আল বাদা ওয়াত তারিখ, আহমাদ বিন সাহল বালখি, পৃ: ৩৭২।

১৩। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাছির, খণ্ড ১, পৃ: ৫৮২।

১৪। উসদুল গাব্বাহ, ইবনে আছির, খণ্ড ৪, পৃ: ১৭।

১৫। তারিখে তাবারি, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৩৭।

১৬। আল মানাকিব ওয়াল মাছালিব, কাজি মাগরেবি, পৃ: ২০৬।

দলিল হচ্ছে তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদের (সা.) পিছনে নামাজ আদায় করেছেন। আর এই বিষয়টি মুতাওয়াতির হাদিস দারা প্রামাণিত। যেমন:

নাসাঈ স্বীয় সনদে হিবাতুল উরফি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযরত আলীকে (আ.) বলতে শুনেছেন যে, সর্বপ্রথম আমিই মহানবী হযরত মুহাম্মাদের (সা.) পিছনে নামাজ আায় করেছি।[১]

যাইদ বিন আরকাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবীর (সা.) পিছনে সর্বপ্রথম নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি হলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব।[২]

আমর বিন মাররা বলেন, আমি আবু হামজাকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন: আমি যাইদ বিন আরকাম থেকে শুনেছি যে, মহানবীর (সা.) পিছনে মর্বপ্রথম নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি হলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব।[৩]

ইবাদ বিন আব্দুল্লাহ বলেন: আমি হযরত আলীকে বলতে শুনেছি যে তিনি বলেছেন, আমি আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসূলের ভাই এবং আমিই সিদ্দকে আকবার। আমি ব্যতীত যে ব্যক্তি এই উপাধি ব্যবহার করবে সে মিথ্যাবাদী এবং অপবাদী বলে গণ্য হবে। আর অন্য সকল মুসলমানের সাত বছর পূর্ব থেকে আমি রাসূলের (সা.) পিছনে নামাজ আদায় করেছি।[৪]

ইবনে মারদুইয়া হাববা বিন জুয়াইন থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী (আ.) বলেছেন: আল্লাহর রাসূলের (সা.) সাথে আমি সাত বছর মহান আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করেছি এবং তখন উম্মতের কেউই আল্লাহর ইবাদত করত না।[৫]

ইবনে আব্বাস বলেন: রাসূল (সা.)-এর সাথে সর্বপ্রথম নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি হলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব। আর জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারি বলেন, মহানবী হযরত মুহাম্মাদের (সা.) নবুয়্যত সোমবারে ঘোষিত হয় এবং হযরত আলী (আ.) মঙ্গলবার তাঁর পিছনে নামাজ আদায় করেন।[৬]

আল ইস্তিয়াব গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (আ.) বলেছেন: আমি

১৭। খাসায়েসে আমিরুল মুমিনিন আলী ইবনে আবি তালিব, নাসাঈ; পৃ: ২০।

১৮। খাসায়েসে আমিরুল মুমিনিন আলী ইবনে আবি তালিব, নাসাঈ; পৃ: ২০।

১৯। তারিখে তাবারি, ইবনে জারির তাবারি, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৩৭।

২০। তারিখে তাবারি, ইবনে জারির তাবারি, ২ম খণ্ড, পৃ: ৫৩৭। আল কামিল ফিত তারিখ, ইবনে আছিল, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৮২।

২১। মানাকিবে আলী ইবনে আবি তালিব, ইস্পাহানি প: ৪৮, হাদিস-৪।

২২। আল কামিল ফিত তারিখ, ইবনে আছিল, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৮২।

মহানবীর সাথে ছয় থেকে সাত বছর নামাজ আদায় করেছি যখন হযরত খাদিজা ব্যতীত কেউ আমাদের সাথে নামাজ আদায় করেনি।

আল ইস্তিয়াব গ্রন্থে আরও বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (আ.) বলেছেন: এই উম্মতে আমার আগে কেউই আল্লাহর ইবাদত করেনি। আমি পাঁচ থেকে সাত বছর এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করেছি যখন কেউই আল্লাহর ইবাদতকারী ছিল না। একই সনদে আবু আইয়্যুব আনসারি থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা.) বলেছেন: সাত বছর ধরে ফেরেশতারা আমার এবং আলীর (আ.) উপর দরুদ পাঠ করেছে। কেননা ওই সময়ে পুরুষদের মধ্যে আলী ব্যতীত আর কেউই আমার পিছনে নামাজ আদায় করে নি।

খাসায়েস গ্রন্থে নাসাঈ স্বীয় সনদে হযরত আলী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: আমি অন্য সকল লোকদের সাত বছর পূর্বে ঈমান আনয়ন করেছি। এছাড়াও তিনি হযরত আলী (আ.) থেকে আরও বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: মহানবীর পর আমার পূর্বে অন্য কেউ আল্লাহর ইবাদত করে নি। আমি নয় বছর আল্লাহর ইবাদত করেছি যখন এই উম্মতের কেউ আল্লাহর ইবাদত করত না। খাসায়েসের গ্রন্থের অন্যত্রও ৯ বছর বলা হয়েছে তবে সঠিক হচ্ছে সাত বছর।[১]

হাকিম তার মুস্তাদরাক গ্রন্থে স্বীয় সনদে ইবাদ বিন আব্দুল্লাহ আসাদি থেকে এবং তিনি হযরত আলী (আ.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি আল্লাহর বান্দা, আমি আল্লাহর রাসূলের ভাই এবং আমিই সিদ্দিকে আকবার (মহাসত্যবাদী)। আমি ব্যতীত যে ব্যক্তি নিজেকে এই উপাধির অধিকারী বলে দাবি করবে সে বড় মিথ্যাবাদী। আমি অন্য সবার সাত বছর পূর্বে থেকে আল্লাহর রাসূলের (সা.) সাথে নামাজ আদায় করেছি যখন কেউই আল্লাহর ইবাদত করত না।[২]

হাকিম হিবাতুল উরফি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি হযরত আলীকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন: আমি পাঁচটি বছর এমন সময়ে আল্লাহর ইবাদত করেছি যখন উম্মতের কেউই আল্লাহর ইবাদত করত না। অন্য আরেকটি বর্ণনায় তিনি বলেছেন যে, হযরত আলী (আ.) বলেছেন: আমি সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহর রাসূলের (সা.) পিছনে নামাজ আদায় করেছে। অনুরূপভাবে হফেজ নাসাঈও খাসায়েস গ্রন্থে হিবাতুল উরফি থেকে একই হাদিস উল্লেখ

২৩। আইয়ানুশ শিয়া, সাইয়্যেদ মোহসেন আমিন, খণ্ড ২, পৃ: ২৬।
২৪। আইয়ানুশ শিয়া, সাইয়্যেদ মোহসেন আমিন, খণ্ড ২, পৃ: ২৬।

করেছেন।[১]

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন: ফেরেশতাগণ সাত বছর ধরে আমার আর আলীর উপর দরুদ পাঠ করেছে। কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন: কেননা পুরুষদের মধ্যে আলী ব্যতীত অন্য কেউ আমার সাথে ছিল না।

মানাকিবে খারাজমিতেও বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা.) বলেছেন: ফেরেশতাগণ সাত বছর ধরে আমার আর আলীর উপর দরুদ পাঠ করেছে। কেননা পৃথিবীতে আমি আর আলী ব্যতীত কলেমা লাইলাহা ইল্লাহ (لا اله الا الله) ধ্বনী উচ্চারণকারী কেউ ছিল না। তাবারিও তার খাসায়েস গ্রন্থে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।[২]

উল্লিখিত হাদিস ও রেওয়ায়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদের (সা.) পিছনে সর্বপ্রথম নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি হচ্ছেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব। তিনি সকল মুসলমানের ৭ বছর পূর্বে নামাজ আদায় করেছেন। কেননা নামাজ শাবে মিরাজে ওয়াজিব হয়। আর মিরাজ হিজরতের তিন বছর পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং নামাজ ওয়াজিব হওয়ার আগেই হযরত আলী (আ.) রাসূলের (সা.) সাথে তাঁর বাড়িতে, হিরা গুহায়, শিবে আবু তালিবে এবং আরও অন্যান্য স্থানে নামাজ আদায় করেছেন।

৩। মহানবী হযরত মুহাম্মাদের (সা.) সর্বপ্রথম ছাত্র

হযরত আলী (আ.) শৈশব থেকেই রাসূলের (সা.) কোলে-পিঠে লালিত-পালিত হয়েছেন। আর ইমাম আলী (আ.) এসময়ে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) থেকে অগণিত ফজিলত অর্জন করেছেন। মহানবীও এসময়ে হযরত আলীকে মারেফাত, জ্ঞান, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা এবং ঐশী জ্ঞানে পরিপূর্ণ করেছেন। তিনি মহানবীর কোলে-পিঠে মানুষ হয়েছে। কাজেই এটা বলা সমিচিন যে তিনিই হলেন মাহনবীর (সা,) সর্বপ্রথম ছাত্র।

কাজি মাগরেবি বলেন: মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) যখন বড় এবং স্বাবলম্বি হলেন তখন তিনি হযরত আবু তালিবের কষ্ট লাঘব করার জন্য হযরত আলীকে নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে নিলেন। কেননা মহানবী শৈশবে পিতামাতা হারিয়ে ছিলেন এবং দাদা আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর চাচা আবু তালিব তাঁর লালন-

২৫। আইয়ানুশ শিয়া, সাইয়্যেদ মোহসেন আমিন, খণ্ড ২, পৃ: ২৫।

২৬। বিহারুল আনওয়ার, আল্লামা মাজলিসী, খণ্ড ৩৮, পৃ: ২৩৯।

পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বিবাহের আগ পর্যন্ত তিনি চাচা আবু তালিবের ত্বত্তাবধানে ছিলেন। হযরত আবু তালিবের এই খেদমতের প্রতিদান স্বরূপ তিনি হযরত আলীর লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেণ। এভাবে তিনি শৈশব থেকেই হযরত আলীর লালন-পালনের দায়িত্ব নেন এবং তাকে দয়ালু পিতা ও দায়িত্বশীল বড় ভাইয়ের মত আদরযত্নে বড় করেন। আর এভাবে হযরত আলী মহানবীর (সা.) কাছ থেকে প্রশিক্ষণলাভ করেছিলেন। তিনি মহানবীর আখলাক ও আদব থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন এবং একটি মূহূর্তের জন্য তিনি আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে সিজদা করেন নি এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করেন নি।[১]

রাসূল (সা.) বলেছেন:

أَعلَمُ اُمَّتِي مِنْ بَعْدِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب.

আমার পরে আলী হলো আমার উম্মতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী।

হযরত আলী (আ.) নাহজুল বালাগার খোতবা কাসেয়াতে এসম্পর্কে বলেছেন:

শৈশবকাল থেকেই আমি রাসূলের (সা.) অনুসরণ করে চলতাম যেভাবে একটা উষ্ট্র-শাবক তার মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে। প্রতিদিনি তিনি ব্যানার (ফলক) আকারে তাঁর কিছু বৈশিষ্ট আমাকে দেখাতেন এবং তা অনুসরণ করতে আমাকে আদেশ দিতেন। প্রতি বছর তিনি হেরা পাহাড়ে নির্জনবাসে যেতেন। সেখানে আমি ব্যতীত আর কেউ তাকে দেখেনি। সে সময়ে আল্লাহর রাসূল (সা.) ও খাদিজার ঘর ছাড়া অন্য কোথাও ইসলামের অস্তিত্ব ছিল না। আর রাসূল (সা.) হযরত খাজা এবং আমি ছাড়া কেউ তখন আল্লাহর ইবাদত করত না। মহানবীর রেসালাতের নুরের তাজাল্লি আমি দেখতাম এবং এবং নবুয়্যতের ঘ্রাণ প্রাণভরে গ্রহণ করতাম।

যখন আল্লাহর রাসূলের উপর ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল তখন আমি শয়তানের বিলাপ শুনেছিলাম। আমি বলেছিলাম হে আল্লাহর রাসূল! এই বিলাপ কিসের? উত্তরে তিনি বললেন: এটা শয়তান যে পুজিত হওয়ার সকল আশা-ভরসা হারিয়ে ফেলেছে। হে আলী ! আমি যা কিছু দেখি দুমি তা-ই দেখ। আর আমি যা কিছু শুনি তুমিও তা-ই শোন; ব্যবধান শুধু এতটুকু যে, তুমি নবী নও বরং তুমি হলে আমার স্থালাভিষিক্ত ও উত্তরাধিকারী এবং তুমি কল্যাণের পথে রয়েছে।[২]

২৭। আল মানকিব ওয়াল মাছালিব, কাজি মাগরেবি, পৃ: ২০৬।

২৮। নাহজুল বালাগা, খোতবা, ১৯১, পৃ: ২৪২।

আমিরুল মুমিনিন হযরত আলী (আ.) সর্বদা এবং সর্বত্র যেমন: ঘরে, মসজিদে, শহরে, মরুভূমিতে এবং জঙ্গলে তাঁর ওস্তাদ মহানবী হযরত মুহাম্মাদের (সা.) সাথে অবস্থান করতেন।

হযরত আলী (আ.) প্রতিদিন সকাল ও সন্ধায় মহানবী হযরত মুহাম্মাদের (সা.) কাছে আসতেন এবং তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান ও মারেফাত অর্জন করতেন। হযরত আলী (আ.) বলেন:

علمني رسول الله الف باب من العلم ، يفتح من كل باب الف باب

মহানবী হযরত মুহাম্মাদের (সা.) আমাকে জ্ঞানে সহস্রটি বাব তথা অধ্যায় শিক্ষা দিয়েছেন যার প্রতিটি থেকে আবার হাজার হাজার বাব তথা অধ্যায় খুলে যায়।[১] একই হাদিস বিহারুল আনওয়াররের ৬৯ নং খণ্ডেও বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আলী (আ.) মহানবী হযরত মুহাম্মাদের (সা.) ছাত্র, তাঁর জ্ঞানের খনি তথা ভান্ডার এবং নবুয়্যতের গোপন রহস্যের রক্ষক ছিলেন। যেভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মাদের (সা.) বলেছেন:

« أنا مدينة العلم و علی بابها فمن اراد العلم فليأته من بابه»

আমি জ্ঞানের শহর এবং আলী তার দরজা, যে কেউ জ্ঞানের শহরে প্রবেশ করতে চায় তাকে এই দরজা দিয়েই প্ররেবশ করতে হবে।[২]

অন্য হাদিসেও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন: আমি জ্ঞানের শহর এবং আলী তার দরজা। আর প্রতিটি শহরে তার দরজা দিয়েই প্রবশে করত হয়।[৩]

রাসূল (সা.) বলেছেন: আমি জ্ঞানের নগরী, আলী সেই নগরীর প্রবেশদ্বার, যে কেউ জ্ঞানের সন্ধান করে সে যেন সেই দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে ।

৪। সর্বপ্রথম ওহী লেখক (কাতেবে ওহী)

কাতেবে ওহী তথা ওহী লেখক কত জন? এসম্পর্কে ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেননা কিছু ঐতিহাসিক ওহীর লেখক এবং মহানবীর অন্যান্য বিষয়ের লেখকদেরকে গুলিয়ে ফেলেছে। কিন্তু তথাপি এতসব মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সকল ঐতিহাসিকরা একমত পোষণ করেন যে, হযরত আলী (আ.) হচ্ছেন সর্বপ্রথম ওহী লেখক। মহানবী হযরত মুহাম্মাদের (সা.)

২৯। শারহুল আখবার, কাজি নোমান আল মাগরেবি, খণ্ড ২, পৃ: ৩০৮; হা. ৬২৯।
৩০।তোহাফুল উকুল, ইবনে শোবা হাররানি, পৃ: ৩১৭।
৩১। তাওহীদ শেখ সাদুক, পৃ: ৩০৭।

উপর রাতে বা দিনে যখনই ওহী অবতীর্ণ হত তিনি সর্বপ্রথম হযরত আলীকে খবর দিতেন এবং তাকে ওহী লিখে রাখতে বলতেন।

এ সম্পর্কে হযরত আলী (আ.) বলেছেন:

আমার কাছে পবিত্র কোরআনের নাসেখ, মানসুখ, মোহকাম, মোতাশাবে, আয়াতের সংযুক্ত ও বিভক্তি এবং হরফ ও অর্থের সকল জ্ঞান রয়েছে। মহান আল্লাহর কসম! রাসূলের উপর অবতীর্ণ হওয়া প্রতিটি হরফের জ্ঞান আমার কাছে আছে। কোন আয়াত কার সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, কবে এবং কোথায় নাজিল হয়েছে তার সবই আমি জানি। তাদের জন্য আক্ষেপ তারা কি এই আয়াত পড়ে নি:

إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ

নিশ্চয়ই এটা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান আছে, ইব্রাহীম ও মুসার গ্রন্থসমূহে।[১]

আল্লাহর কসম! আমি এই জ্ঞান রাসূলুল্লাহর (সা.) কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি এবং রাসূল (সা.) হযরত ইব্রাহীম এবং মুসার (আ.) কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। আল্লাহর শপথ! আমি হলাম সেই ব্যক্তি যার জন্য মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন:

وَ تَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ

আর সংরক্ষণকারী কান তা সংরক্ষণ করে।[২]

হযরত আলী (আ.) বলেন: আমি সর্বদা রাসূলুল্লাহর (সা.) সভায় উপস্থিত থাকতাম। মহানবী হযরত মুহাম্মাদের (সা.) উপর ওহী অবতীর্ণ হত আমি বুঝতে পারতাম কিন্তু অন্যরা তা বুঝতে পারত না। আর জলসা থেকে বের হওয়ার পর সবাই আমাকে জিজ্ঞাসা করত: রাসূল (সা.) এখন কি বললেন?[৩]

হযরত আলী (আ.) মহানবীর সব থেকে ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রাসূলের (সা.) নিকটে থাকতেন এবং নবুয়্যতের গৃহে যা কিছু ঘটত তার সব খবর তিনি রাখতেন। আর যখনই ওহী অবতীর্ণ হত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) হযরত আলীকে তা পড়ে শুনাতেন এবং হযরত আলী তা লিখে রেখে হেফাজত করতেন।

৫। পবিত্র কোরআনের সর্বপ্রথম সংকলকারী

৩২। সূরা আ'লা, আয়াত: ১৮ এবং ১৯।

৩৩। সূরা হাক্কাহ, আয়াত: ১২।

৩৪। বিহারুল আনওয়ার ৪০তম খণ্ড, পৃ: ১৩৮, হা. ৩১।

মহানবীর (সা.) ওফাতের পর পবিত্র কোরআনকে নাজিলের ধারাবাহিকতায় সর্বপ্রথম হযরত আলী (আ.) সংকলন করেছিলেন। আর এই বিষয়টি শিয়া-সুন্নি উভয় ফেরকার পক্ষ থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে প্রমাণিত। আল ইতকান ফিল উলুমিল কোরআন গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলের (সা.) ওফাতের পর সর্বপ্রথম হযরত আলী ইবনে আবি তালিব পবিত্র কোরআন সংকলন করেন। ইবনে আবি দাউদ আল মাসাহেফ গ্রন্থে ইবনে সিরিন থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী (আ.) বলেছেন: রাসূলের (সা.) ওফাতের পর আমি অঙ্গিকার করি যে, কোরআন সংকলন না করা পর্যন্ত আমি নামাজের সময় ব্যতীত আবা গায়ে দিব না। আর এভাবে আমি কোরআন সংকলন করি। ইবনে হাজার এই রেওয়ায়েতের সনদে ত্রুটি থাকায় সেটাকে দূর্বল হাদিস হিসাবে গণ্য করেছে। কিন্তু সুয়ুতি আল ইতকান গ্রন্থে তাকে জাবাব দিয়েছেন যে, এই সূত্রে যদি ত্রুটি থেকেও থাকে হাদিসটি অন্যান্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে এবং সেখানে কোন ত্রুটি নেই। যেমন: ইবনে জারিস তার ফাজায়েল গ্রন্থে বাশান বিন মুসা, তিনি হুদা বিন খালিফা থেকে, তিনি আওন থেকে তিনি মুহাম্মাদ বিন সিরিন থেকে আর তিনি আকরামা থেকে বর্ণনা করেছেন: আবু বকরের হাতে বায়ত নেয়ার সময় হযরত আলী বায়াত করেন নি এবং বাড়িতে ছিলেন। আবু বকরকে বলা হল আলী আপনার হাতে বায়াত করতে চায় না। তখন আবু বকর হযরত আলীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল: আপনি কেন আমার হাতে বায়ত করতে আসেন নি? হযরত আলী (আ.) জবাবে বললেন: আমি দেখলাম যে, পবিত্র কোরআনে পরিবর্তন হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে, কাজেই আমি অঙ্গিকার করলাম যে, সম্পূর্ণ কোরআন সংকলন না করা পর্যন্ত নামাজ পড়ার সময় ছাড়া আবা পরিধান করব না।

সূয়ুতী আরও বলেন, ইবনে আশতা তার মাসাহেফ গ্রন্থে ইবনে সিরিন থেকে অন্য সূত্রে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন হযরত আলী (আ.) তাঁর মোসহাফে নাসেখ এবং মানসুখও বর্ণনা করেছেন। ইবনে সিরিন বলেন, আমি হযরত আলীর মোসহাফকে খোজ করেছি এবং মদিনায়ও খোজ করেছি কিন্তু আমি সেটাকে হস্তগত করতে পারি নি।

ইবনে সা'দ ছাড়াও ইবনে আব্দুল বার তার আল ইস্তিয়াব গ্রন্থে ইবনে সিরিন থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি শুনলাম যে হযরত আলী আবু বকরের হাতে বায়াত করেন নি। তখন আবু বকর বলল: আপনি কি আমার খেলাফাতের প্রতি অসন্তুষ্ট? হযরত আলী (আ.) জবাব দিলেন: আমি ওয়াদা করেছি যে, কোরআন সংকলন সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত শুধুমাত্র নামাজের সময় ছাড়া আবা পরিধান

করব না।

ইবনে সিরিন বলেন: সকলেই এটা বলেছেন যে, হযরত আলী (আ.) পবিত্র কোরআনকে অবতীর্ণ হওয়ার ধারাবাহিকতায় (তারতিবে নুযুল অনুসারে) সংকলন করেছেন।

ইবনে সিরিন বলেন: ঐ গ্রন্থটি (হযরত আলীর সংকলিত কোরআনটি) যদি আমরা পেতাম তাহলে জ্ঞানের খনি তথা ভান্ডার পেয়ে যেতাম।

ইবনে আওফ বলেন: আমি আকরামার কাছে ঐ গ্রন্থটি (হযরত আলীর সংকলিত কোরআনটি) সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম। সে বলল: আমি এ সম্পর্কে কিছু জানি না।

আল ইতকান গ্রন্থে কয়েটি রেওয়ায়েত রয়েছে যেখানে ইবনে হাজার বলেছেন: একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত আলী (আ.) মহানবীর (সা.) ওফাতের পর পবিত্র কোরআনকে নুযুলের ধারাবহিকতায় সংকলন করেছিলেন। আর এই হাদিসটি আবু দাউদও বর্ণনা করেছেন।

আবু নাইম তার আল হিলিয়া গ্রন্থে এবং খাতিব তার আরবাইন গ্রন্থে সুদ্দির সনদে এবং আব্দুল খাইর হযরত আলী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলের (সা.) ওফাতের পর আমি অঙ্গিকার করি যে, পবিত্র কোরআন সংসকলন না করা পর্যন্ত আমি আবা পরিধান করব না। আর আমি কোরআন সংকলন না করা পর্যন্ত গায়ে আবা দেই নি।

ইবনে নাদিম তার ফেহরেস্ত গ্রন্থে আব্দুল খাইর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী (আ.) বলেছেন, রাসূলের (সা.) ওফাতের পর মানুষের মধ্যে অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা দেখতে পাই। তখন আমি প্রতিজ্ঞা করি যতক্ষণ পর্যন্ত আমি কোরআন সংকলন না করব ততদিন আমি আবা গায়ে দিব না। আর এভাবে তিনি টানা তিনদিন নিজের ঘরে অবস্থান করেন এবং সম্পূর্ণ কোরআন সংকলন করেন। আর এটাই হল সর্বপ্রথম কিতাব (কোরআন) যা হযরত আলী (আ.) সম্পূর্ণরূপে নিজের হিফজ (মুখস্ত) থেকে লিখেছিলেন। আর সেটা এখন ইমাম জাফর সাদিকের (আ.) কাছে আছে।

মানকিবে ইবনে শাহরে আশুবে আহলে বাইতের সুত্র অনুযায়ী হযরত আলী (আ.) ওয়াদা করেছিলেন যতদিন তিনি কোরআন সংকলন না করবেন ততদিন পর্যন্ত তিনি শুধুমাত্র নামাজের সময় ছাড়া আবা পরিধান করবেন না। আর এই কাজ (কোরআন সংসকলন করা) সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি ঘর থেকে বের হন নি।

ইবনে শাহরে আশুব তার মানাকিব গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন: আহলে সুন্নতের

তাফসীর ও হাদিসের ইমাম জনাব শিরাজি তার স্বীয় তাফসীরে এবং আবু ইউসুফ ইয়াকুব স্বীয় তাফসীরে আল্লাহর এই কথার তাফসীর সম্পর্কে বলেন:

انَّ علَينا جمعه و قرانه

নিশ্চয়ই এটার সংরক্ষণ ও পাঠ করার দায়িত্ব আমাদেরই।[১]

ইবনে আব্বাস বলেছেন: মহান আল্লাহ এই আয়াতে মহানবী হযরত মুহাম্মাদকে (সা.) নিশ্চয়তা দিয়েছেন ওনার ওফাতের পর কোরআনের সংকলন হযরত আলী করবেন। ইবনে আব্বাস বলেন: মহান আল্লাহ হযরত আলীর কলবে পরিপূর্ণ কোরআন অবতীর্ণ করেন। আর হযরত আলী (আ.) রাসূলের (সা.) ওফারেত পর ৬ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ কোরআন সংকলন করেন।

আবু রাফে থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর ওফাতের পূর্বে অসুস্থ অবস্থায় হযরত আলীকে বলেন: হে আলী! এটা আল্লাহর কিতাব এটাকে নিজের কাছে রাখ। হযরত আলী (আ.) সমস্ত লেখাগুলো একটি কাপড়ে পেচিয়ে সাথে করে নিয়ে গেলেন। অতঃপর মহানবীর ওফাতের পর হযরত আলী (আ.) নুযুলের ধারাবহিকতায় কোরআনকে সংকলন করেন আর হযরত আলীর মধ্যে তার (কোরআনের) পরিপূর্ণ জ্ঞান বিদ্যমান ছিল।

ইবনে শাহরে আশুব বলেন আবু আলা আত্তার এবং মোয়াফফাক খাতিব খারাজমি স্বীয় গ্রন্থে আলী ইবনে আরবাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা.) হযরত আলীকে কোরআন সংকলন করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর হযরত আলীও তা লিখে সংকলন করেছেন।

ইবনে শাহরে আশুব মায়ালেম গ্রন্থে বলেন: এটাই সত্য যে ইসলামে সর্বপ্রথম হযরত আলী আল্লাহর কিতাব কোরআন সংকলন করেন।

ইবনে মুনাদি থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আলী (আ.) তিন দিন একাধারে নিজের বাড়িতে অবস্থান করেন এবং কোরআন সংকলন করেন। আর এটাই হল ইসলামের সর্বপ্রথম মোসহাফ তথা কোরআন যা হযরত আলী স্বীয় হিফজ থেকে সংকলন করেন।[২]

ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন: যে ব্যক্তি দাবি করবে যে সে প্রথম সম্পূর্ণ কোরআন সংকলন করেছে সে মিথ্যাবাদী। কেননা সর্বপ্রথম যিনি সম্পূর্ণ কোরআন সংকলন করেন তিনি হলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আ.)

৩৫। সূরা কিয়ামাহ, আয়াত: ১৭।

৩৬। আইয়ানুশ শিয়া সাইয়্যেদ মোহসেন আমিন, খণ্ড, ৭ পৃ: ৩৪৫।

অতঃপর তার পরবর্তী ইমামগণ (আ.) সম্পূর্ণ কোরআন সংকলন করেন।[১]
কিছু হাদিস অনুযায়ী হযরত আলী (আ.) মহানবীর (সা.) জীবদ্দশায় কোরআন সংকলন করেন এবং রাসূলের (সা.) ওফাতের পর নুযুলের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী কোরআন সংকলন করেন।
সকলেই এই বিষয়ে একমত এবং ইবনে আবিল হাদিদও এভাবে বলেছেন যে, হযরত আলী (আ.) রাসূলের জীবদ্দশায় কোরআন হিফজ করতেন এবং তিনি ব্যতীত অন্য কেউ কোরআন হিফজ করত না। আর তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি পবিত্র কোরআনকে সংকলন করেন। আর সকলেই এটা বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী (আ.) আবু বকরের সাথে বায়ত করতে আসেন নি। আর আহলে হাদিসের মতের সাথে শিয়াদের মতের বিরোধ আছে কেননা শিয়ারা বলে যে, হযরত আলী (আ.) যেহেতু কোরআন সংকলনে ব্যস্ত ছিলেন তাই তিনি বায়াত করতে আসেন নি। এটা শিয়াদের আকিদা নয়; এটা হচ্ছে ইবনে আবিল হাদিদের আকিদা যার সাথে শিয়া আকিদার কোন সম্পর্ক নেই। কেননা শিয়াদের আকিদা হল হযরত আলী (আ.) কখনোই তিন খলিফাকে সঠিক ও সত্য খলিফা হিসাবে গ্রহন করেন নি। কিন্তু ইসলামের স্বার্থে তিনি কখনো কখনো খলিফাদের দরবারে যেতেন এবং স্বীয় মূল্যবাণ পরামর্শ দিয়ে তাদের সহযোগিতাও করতেন, যাতে ইসলাম সুরক্ষিত থাকে। সুতরাং এধরনের বর্ণনা থেকে যেন কখনোই এমন ভ্রান্ত ধারনা সৃষ্টি না হয় যে শিয়ারা আকিদা পোষণ করে যে, হযরত আলী (আ.) খলিফাদের হাতে বায়াত গ্রহন করেছেন। মোটকথা উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, হযরত আলী (আ.) সর্বপ্রথম কোরআন সংকলন করেছেন। আর যদি মহানবীর (সা.) জীবদ্দশায় কোরআন সংকলিত হত তাহলে পূনরায় তা সংকলন করার প্রয়োজন হত না। আর কারায়াতের গ্রন্থসমূহ অধ্যায়ন করলে বোঝা যায় যে, কোরআনের কারায়াতের ইমামগণ যেমন: আবু আমরু আলা, আসেম বিন আবিন নুখুদ এবং অন্যদের কারায়াতের উৎস তথা ওস্তাদ হচ্ছেন হযরত আলী (আ.)। কেননা এদের সবার কারায়াতের ওস্তাদ হলেন আবু আব্দুর রহমান সালামি আর আবু আব্দুর রহমান সালামি কারায়াত শিখেছেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব থেকে। আর এভাবেই কোরআনের কারায়াতও এমন একটি বিদ্যা যার জনকও হলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব।[২]

৩৭। উসুলে কাফি, শেখ কুলাইনি, খণ্ড ১, পৃ: ২৮৪।
৩৮। শারহে নাহজুল বালাগ, ইবনে আবিল হাদিদ, খণ্ড ১, পৃ: ৪৩।

ইবনে শাহরে আশুব তার মানাকিব গ্রন্থে লিখেছেন:

কারায়াত বিদ্যার সাতজন প্রসিদ্ধ কারীর (কোররায়ে সাবয়া) কারায়াতের উৎস হলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব। কেননা হামজা আর কাসায়ী হযরত আলী এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের কারায়াত অনুযায়ী কোরআন তিলাওয়াত করতেন। যদিও তারা দুজনই হযরত আলীর কারায়াত অনুসরণ করতেন এবং ইবনে মাসউদের এরাবের (হরকতের) অনুসরণ করতেন। আর ইবনে মাসউদ নিজেই বলেন, আমি হযরত আলীর চেয়ে উত্তম কোন কোরআন তিলাওয়াতকারী দেখিনি।

নাফে, ইবনে কাছির এবং আবু আমরু ইবনে আব্বাসের কারায়াত অনুযায়ী কোরআন তিলাওয়াত করত। আর ইবনে আব্বাস কোরআনের কারায়াত শিখেছিলেন উবাই বিন কাব এবং হযরত আলী (আ.) থেকে। আর এই কারীদের তিলাওয়াত উবাই বিন কাবের কারায়াত থেকে ভিন্ন নয়। সুতরাং তাদের কারায়াতের মারজা তথা উৎসও হলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আ.)।

আসেম কোরআনের কারায়াত শিখেছেন আবু আব্দুর রহমান সালামি থেকে। আর আবু আব্দুর রহমান সালামি বলেন: আমি সম্পূর্ণ কোরআন হযরত আলীর সামনে তিলাওয়াত করেছি। আর এ জন্যই কারায়াত বিদ্যার বিশেষজ্ঞরা বলেন আসিমের কারায়াত হচ্ছে সবচেয়ে সঠিক কারায়াত। কেননা তিনি কোরআনের নুযুল অনুযায়ী কোরআন তিলাওয়াত করতেন। যে সকল স্থানে অন্য কারীগণ ইদগাম করেছেন আসেম সেখানে ইজহার করে পড়েছেন। আর অন্য কারীগণ যেখানে হামজাকে তারকিক করে পড়েছেন তিনি সেটাকে জাহির (তাফখিম) করে পড়েছেন। আর যে আলিফসমূহকে অন্য কারীগণ আমালাহ আকৃতিতে পড়েছেন আসেম সেটাখে ফাতাহর আকৃতিতে পড়েছেন। আর পত্রি কোরআনের কুফি আয়াত সংখ্যা (৬২৩৬) হযরত আলী থেকেই বর্ণিত হয়েছে। আর সাহাবাদের মধ্যে হযরত আলী ব্যতীত কেউ কোরআনের আয়াতের এই পরিমাণ সংখ্যার কথা বলেন নি।[১]

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হযরত আলী (আ.) সর্বপ্রথম কোরআন সংকলন করেন এবং তিনি সম্পূর্ণ কোরআনের হাফেজ ছিলেন। আর তিনিই হচ্ছেন কারায়াত বিদ্যার সাতজন প্রসিদ্ধ কারীর (কোররায়ে সাবয়া) কারায়াতের উৎস।

৩৯। মানাকিবে ইবনে শাহওে আশুব, খণ্ড ২, পৃ: ৫২।

৬। মহানবী হযরত মুহাম্মাদের (সা.) হাতে সর্বপ্রথম বায়াতকারী

ঐতিহাসিকগণ বলেছেন মহানবীর হাতে সর্বপ্রথম বায়াতকারী এবং তাঁর সাহায্যকারী হলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব। আবু বকর শিরাজি স্বীয় গ্রন্থে জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবীর হাতে সর্বপ্রথম বায়াত করেন হযতর আলী (আ.), অতঃপর আবু সানান আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব আসাদি এবং তারপর হযরত সালমান ফার্সি বায়াত করেন। আর লাইসের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আলীর পর মহানবীর (সা.) হাতে সর্বপ্রথাম বায়াত গ্রহন করেন জনাব আম্মার ইয়াসির। আর হযরত আলীর শ্রেষ্ঠত্ব এই আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ বেহেশতের বিনিময়ে মুমিনদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে শত্রুদেরকে হত্যা করে এবং নিজেও নিহত হয়। এটাই তাওরাত ও ইঞ্জিলে এবং পবিত্র কুরআনে আল্লাহর দেয়া ওয়াদা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে এবং অঙ্গীকার পালনে আল্লাহর চেয়ে কে বেশি বিশ্বস্ত? তাই আল্লাহর সাথে তোমাদের যে কেনা-বেচা হয়েছে, সেজন্য আনন্দিত হও এবং এটাই বড় সাফল্য।[১]

কেননা এই আয়াতে মহান আল্লাহ বায়াতের যে সকল ফলাফল উল্লেখ করেছেন তার সবাই হযরত আলীর মধ্যে বিদ্যমান ছিল এবং অন্য কারও মধ্যে তা ছিল না।

সকল রাবিগণ হযরত জাবির থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: আমি রাসূরুল্লাহর হাতে এই মর্মে বায়াত করেছি যে, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আপনার সঙ্গ ত্যাগ করব না। নাসওয়ার মারেফাত গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, সালমা বিন আকওয়ার কাছে জিজ্ঞাসা করা হল গাছের নিচে লোকেরা কিভাবে মহানবীর হাতে বায়াত করেছিল?

তিনি জবাব দিলেন: মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহর (সা.) সঙ্গ দেয়ার।

৪০। সূরা তাওবা, আয়াত: ১১১।

বসরাবাসী থেকে রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, আহমাদ বিন ইয়াসার বলেন: হুদাইবিয়াতে রাসূলের (সা.) হাতে বায়াতকারীগণ ওয়াদা করেছিলেন যে, তারা কখনোই ময়দান ত্যাগ করেবন না। আর সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, হযরত আলী (আ.) তাঁর এই ওয়াদার উপর অটল ছিলেন এবং কখনোই তিনি কোন ময়দান থেকে পালিয়ে যান নি। কিন্তু অন্যরা তাদের ওয়াদা রক্ষা করতে পারে নি। এছাড়াও মহান আল্লাহ একমাত্র মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট। অপরদিকে আবু আউফি বর্ণিত রেওয়ায়েত অনুসারে হুদাইবিয়াতে রাসূলের (সা.) হাতে বায়াতকারীর সংখ্যা ছিল ১৩০০ জন। জাবেরের বর্ণনা অনুযায়ী বায়াতকারীর সংখ্যা ছিল ১৪০০ জন। ইবনে মুসাইয়্যেবের বর্ণনা অনুযায়ী বায়াতকারীর সংখ্যা ছিল ১৫০০ জন। আর ইবনে আব্বাসের বর্ণনা অনুযায়ী বায়াতকারীর সংখ্যা ছিল ১৬০০ জন। আর এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, বিন কাইস এবং আব্দুল্লাহ বিন আবু সাসুলের মত মুনাফিকও এই বায়াতকারীদের মধ্যে ছিল। অপরদিকে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনের আয়াতে নিজের সন্তুষ্টিতে শুধুমাত্র মু'মিনদের জন্য নির্ধারিত রেখেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তাঁরা (হুদায়বির্য়ায়) গাছের নিচে আপনার হাতে বায়াত গ্রহণ করেছিল; অতঃপর তিনি তাদের অন্তরে কী ছিল তা জেনে নিয়েছেন, ফলে তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করলেন নিকটবর্তী বিজয় দিয়ে।[১]

তাঁরা হুদাইবিয়ায় এক গাছের নীচে মহানবীর কাছে শপথ গ্রহণ করেছিলেন যে, তাঁরা মক্কার কুরাইশদের সাথে লড়বেন এবং পলায়নের পথ অবলম্বন করবেন না।

সুদ্দি এবং মুজাহিদ বলেন: বাইয়ারেত পর সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন তিনি হলেন হযরত আলী (আ.)। কেননা মহান আল্লাহ তাঁর সততা ও ওয়াদা পালনের ইচ্ছার খবর রাখতেন।[২]

৭। মহানবী হযরত মুহাম্মাদের (সা.) সর্বপ্রথম ওয়াসী

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ইসলামের দাওয়াতের প্রথম দিন থেকেই হযরত

৪১। সূরা ফাতহ, আয়াত: ১৮।

৪২। মানকিব ইবনে শাহরে আশুব, খণ্ড, ২, পৃ: ২৮।

আলীকে নিজের উত্তরাধীকারী নিযুক্ত করেন। যেদিন তিনি নিজের নিকট আত্মীয়দের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন, সেদিন সবার সামনে হযরত আলীর হাত ধরে বলেছিলেন: এই আলী হচ্ছে আমার ভাই, আমার উজির, আমার ওয়াসী এবং তোমাদের মাঝে আমার উত্তরাধিকারী। তোমরা তার সকল কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে।[১]

রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আলী (আ.) সম্পর্কে বলেন:

هَذَا أَخي و وَصِيّي و خَلِيفَتِي مِن بَعْدِي، فَاسْمَعُوا لَهُ و أَطِيعُوه ·

এ হলো আমার ভাই, আর আমার পরে আমার ওয়াসী এবং খলীফা। তার নির্দেশের প্রতি কর্ণপাত করো এবং তার আনুগত্য করো।[২]

হযরত আলী (আ.) রাসূল (সা.)-এর ওয়াসী এবং উত্তারাধিকারী ছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) নিজের সাহাবিদেরকে পরস্পরের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করলেন এবং হযরত আলীকে কারও ভাই বানালেন না। তখন হযরত আলী (আ.) বললেন: হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! সবাইকে পরস্পরের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করলেন কিন্তু আমি একা রয়ে গেলাম। তখন রাসূল (সা.) বললেন: আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য রেখে দিয়েছি। তুমি দুনিয়া এবং আখিরাতে আমার ভাই। তুমি আমার ওয়াসী এবং আমার পর আমার উত্তরাধিকারী। তুমি আমার আহলে বাইতের সর্বোত্তম সম্পদ। তোমার সাথে আমার সম্পর্ক হল হারুন আর মুসার ন্যায় শুধুমাত্র পার্থক্য হচ্ছে আমার পর আর কোন নবী আসবে না।[৩]

রাসূল (সা.) বারংবার এই কথা বলতেন এবং নিজের আচার আচরণের মাধ্যমে সর্বদা এই সত্যকে প্রচার করতেন। আর অসংখ্য হাদিস দ্বারাও বিষয়টি প্রমাণিত। সুতরাং মহানবীর (সা.) সর্বপ্রথম ওয়াসী হলেন হযরত আলী (আ.)। আর এই উপাধি রাসূল (সা.) নিজেই হযরত আলীকে দিয়েছিলেন।

রাসূলের (সা.) ওফাতের পর যে হযরত আলী (আ.) তাঁর পরবর্তী খলিফা তথা উত্তরাধিকারী হবেন সেটা মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

يَاَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغ مَا اُنزِلَ اِلَيکَ مِن رَّبِّکَ وَ اِن لَّم تَفعَل فَمَا بَلَّغتَ رِسَالَتَه وَ اللهُ يَعصِمُکَ

৪৩। আমালি, শেখ তুসি পৃ: ৪৪৭।

৪৪। তারীখে তাবারী ২:৩৩১; মাআলিমুত তানযীল ৪:২৭৯; আল কামিল ফিত তারীখ ২:৬৩, শারহে নাহজুল বালাগা ইবনে আবিল হাদীদ ১৩:২১১; কানযুল উম্মাল ১৩:১৩১।

৪৫। আল মানাকিব ওয়াল মাছালিব পৃ: ২০৭।

من النَّاس انّ الله لا يهدى القوم الكفرين

হে রাসূল! আপনার রবের কাছ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করুন; যদি না করেন তাহলে আপনি রেসালাতের কিছুই প্রচার করলেন না। আর আল্লাহ আপনাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে হেদোয়াত করেন না।[১]

হযরত আলীর মধ্যে ইমামত ও নেতৃত্বের সকল বৈশিষ্ট বিদ্যমান ছিল। তিনি হলেন মাসূম, সর্বাধিক জ্ঞানী, সাহসী বীর, মুত্তাকি পরহেজগার। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) গাদীরে খুমের ময়দানে তাঁকে নিজের স্থাভিষিক্ত হিসাবে ঘোষণা দিয়ে যান।

আমি যার মাওলা আলীও তার মাওলা। হে খোদা! যে আলীর সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখে তুমিও তার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখ, যে আলীর সাথে শত্রুতা রাখে তুমিও তার সাথে শত্রুতা রাখ।[২]

গাদীরে খুমের ঘটনা এমন একটি সত্য যার মধ্যে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই এবং কেউ সেটাকে অস্বীকার করার ক্ষমতা রাখে না। শিয়া-সুন্নি উভয় সুত্রে বর্ণিত হয়েছ যে, রাসূল (সা.) গাদীরে খুমের ময়দানে বলেছেন:

مَن كنت مولاه فهذا علي مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأنصر من نصره وأخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار.

আমি হচ্ছি মুমিন-বিশ্বাসীদের ওলি ও অভিভাবক। আর আমি যার নেতা ও অভিভাবক, আলীও তার নেতা ও অভিভাবক। এরপর তিনি দোয়া করেন, হে আল্লাহ ! যে আলীকে ভালবাসে তুমি তাকে দয়া ও অনুগ্রহ করো, আর যে আলীর সাথে শত্রুতা করে, তুমি তার প্রতি একই মনোভাব পোষণ করো। আর আলী যেদিকে যায় সত্যকে তুমি সেদিকে পরিচালিত কর।[৩]

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এসব বার্তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতে উপস্থিত সবার প্রতি নির্দেশ দেন। তখনও সমবেত হাজীরা ওই স্থান ত্যাগ করেননি। এরই মধ্যে হযরত জিব্রাঈল (আ.) আল্লাহর বাণী নিয়ে অবতির্ণ হলেন, মহান রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেছেন:

الْيَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً

৪৬। সূরা আয়িদা, আয়াত: ৬৭।

৪৭। সহি মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৬২, মুসনাদে ইমাম হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-২৮১।

৪৮। দায়ায়েমুল ইসলাম, কাজি মাগরেবি, খণ্ড ১, পৃঃ ২০।

আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন বা জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করলাম।[১]

আল্লামা আমিনি তার মহামূল্যবান আল গাদীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, হাদিসে গাদীরকে ১১০ জন সাহাবা, ৮৫ জন তাবেইন এবং ৩৬০ জন আলেম ও মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন। এটা থেকে প্রমাণিত হয় যে, হাদিসে গাদীর হচ্ছে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও মুতরাওয়াতির হাদিস। সুতরাং এই হাদিস এতটাই সহীহ ও মুতাওযাতির যে কেউ তা অস্বীকার করতে পারে না।

৮। ইসলামের সর্বপ্রথম ইমাম

ইসলামে সর্বপ্রথম যাকে ইমাম উপাধি দেয়া হয়েছে তিনি হলেন হযরত আলী (আ.)। এখানে ইমাম বলতে নেতা ও পথপ্রদর্শক বোঝানো হয়েছে। যার ফলে সকল মুসলমানের উপর তার কথা ও কাজের উপর আমল করা ওয়াজিব করা হয়েছে। আর ইমামত বলতে রাসূলের খলিফা এবং উত্তরাধিকারী বোঝানো হয়েছে। সুতরাং মহানবীর পর হযরত আলী (আ.) হলেন মুসলমানদের খলিফা, ইমাম ও পথপ্রদর্শক।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর জীবদ্দশায় হযরত আলীর জন্য ইমাম শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তিনি হযরত আলীর বিশেষ কিছু বৈশিষ্টর উল্লেখ করেছেন।

শাবি বলেন, হযরত আলী (আ.) বলেছেন: মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আমাকে অসতে দেখে বলেন: মারহাবা হে মুসলমানদের নেতা এবং পরহেজগারদের ইমাম।[২]

আব্দুল্লাহ ইবনে যুরারা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা.) বলেছেন: আলীর ফজিলতে আমার উপর তিনটি বানী অবতীর্ণ হয়েছে। সে মুসলমানদের নেতা ও পথপ্রদর্শক, পরহেজগারদের ইমাম এবং সম্মানিতদের নেতা।[৩]

আর আরও কিছু হাদিসে হযরত আলীকে রাসূল (সা.) সৎকর্মশীলদের নেতা হিসাবে পরিচয় করিয়েছেন। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারি থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা.) হযরত আলীর হাত উচু করে ধরে বলেছেন: এই ব্যক্তি

৪৯। সূরা মায়েদা; আয়াত-৩।

৫০। মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব, খণ্ড ৩, পৃ: ১৯।

৫১। মানাকিবে আলী ইবনে আবি তালিব, পৃ: ৫৮, হা:২০।

হচ্ছে সৎকর্মশীলদের নেতা এবং ফাজের ও ফাসেকদের সাথে যুদ্ধকারী। যে তার বিরোধিতা করবে সে অপমানিত হবে এবং যে তাকে সাহায্য করবে মহান আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন।[১]

রাসূল (সা.) বলেছেন:

عَلِيٌّ الصِّدِّيقُ الْاَكْبَرُ، وَ فَارُوقُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ، وَ يَعسُوبُ الْمُؤْمِنِينَ.

আলী ঈমানে সর্বাপেক্ষা দৃঢ়পদ, উম্মতের মধ্যে হক ও বাতিলে পার্থক্যকারী আর মুমিনদের কর্তা।[২]

৯। ইসলামের সর্বপ্রথম আমিরুল মুমিনিন

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) নিজের জীবদ্দশায় হযরত আলীকে আমিরুল মু'মিনিন উপাধিতে ভুষিত করেন। তিনিই সর্বপ্রথম এই উপাধিকে সৌন্দর্যমন্ডিত করেছেন। আর এ জন্যই যেখানেই আমিরুল মু'মিনিন শব্দটি ব্যবহৃত হয় সেখানেই হযরত আলীকে বোঝানো হয়।

রাসূল (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি হযরত আলীকে বলেছেন: নিশ্চয়ই সে মুসলমানদের নেতা, মুত্তাকীদের ইমাম এবং নূরানী ও শুভ্র মুখমণ্ডলের অধিকারীদের সর্দার। আমার পর গোটা বিশ্বের সকল সৃষ্টির জন্য হুজ্জাত, সকল ওয়াসীদের নেতা এবং সকল নবীগনের ওয়সীদের সর্দার।[৩]

হযরত আলীর ফজিলতে তিনি আরও বলেছেন: আলী সকল মুসলমানের ইমাম, মুমিনদের আমির (নেতা) এবং আমার পর সবার মাওলা ও শাসক।[৪]

আনাস বিন মালিক বলেন, রাসূল (সা.) বললেন: আমাকে ওজুর জন্য পানি দাও। অতঃপর তিনি ওজু করে দুই রাকাত নামাজ আদায় করে বললেন: হে আনাস যে ব্যক্তি এই দরজা দিয়ে সব্যপ্রথম প্রবেশ করবে সে হচ্ছে সকল মুমিনদের আমির, নূরানী ও শুভ্র মুখমণ্ডলের অধিকারীদের ইমাম এবং সকল মুমিনের সর্দার।

আলা বিন মুসাইয়্যাব, আবু দাউদ এবং বুরাইদা আসলামি থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা.) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন সকলেই

৫২। ইয়ানাবি আল মাওয়াদদাহ, হাফেজ কান্দুজি, খণ্ড ২, পৃ: ২১৪। মোস্তাদরাক আলাস সাহিহাইন, খণ্ড ৩, পৃ: ১৪০।

৫৩। কানযুল উম্মাল ১১:৬১৬/৩২৯৯০, আল মু'জামুল কাবীর-তাবারানী ৬:২৬৯/৬১৮৪।

৫৪। আত তাহসিন, পৃ: ৫৬৩।

৫৫। বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড, ৮, পৃ: ২২।

হযরত আলীকে আমিরুল মুমিনিন বলি। সেখানে আমরা সাত জন ছিলাম আর আমি ছিলাম সবার ছোট।[১]

বিহারুল আনওয়ারের হাদিসে এর থেকেও বেশী বিস্তারিত বর্ণণা করা হয়েছে। যেভাবে আনাস বলেন: রাসূল (সা.) বললেন: আমাকে ওজুর জন্য পানি দাও। অতঃপর তিনি ওজু করে দুই রাকাত নামাজ আদায় করে বললেন: হে আনাস! যে ব্যক্তি এই দরজা দিয়ে সর্বপ্রথম প্রবেশ করবে সে হচ্ছে সকল মুমিনদের আমির, নূরানী ও শুভ্র মুখমণ্ডলের অধিকারীদের ইমাম এবং সকল মুমিনের সর্দার।

আনাস বলেন: আমি অন্তর থেকে চাচ্ছিলাম যে, সেই ব্যক্তি আনসারদের মধ্য থেকে কেউ হোক। তাই যখন হযরত আলী (আ.) আসলেন আমি রাসূল (সা.) থেকে বিষয়টি গোপন রাখলাম।

রাসূল (সা.) যখন নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন: কে এসেছে? আমি বললাম: হযরত আলী। এটা শোনার পর রাসূল (সা.) মুচকি হেসে উঠে দাড়ালেন এবং হযরত আলীকে জড়িয়ে ধরে নিজের মুখের ঘাম আলীর মুখে লাগালেন এবং আলীর মুখের ঘাম নিজের মুখে লাগিয়ে নিলেন।

তখন হযরত আলী (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আজ আপনি যা করলেন এর আগে কখনো আপনি এমনটি করেন নি।

রাসূল (সা.) বললেন: আমি এমনটি কেন করব না যেখানে তুমি আমার বিশ্বস্ত, আমার পর মানুষের কাছে আমার পয়গম পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব তোমার এবং আমার পর মানুষের সমস্যার সমাধান করা দায়িত্বও তোমরার উপর।[২]

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) শুধু উপাধি দিয়েই ক্ষান্ত হন নি বরং তিনি জনগণকে নির্দেশ দিলেন তারা যেন হযরত আলীকে আমিরুর মু'মিনিন বলে সালাম দেয়। হুজাইফা ইয়ামানির দাস সালেম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন হযরত আলীকে আস সালামু আলাইকা ইয়া আমিরাল মুমিনিন ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বলে সালাম দেই।[৩]

১০। ইসলামের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মত্যাগী

৫৬। তারিখে দামেস্ক, ইবনে আসাকির, খণ্ড ৪২, পৃ: ৩০৩।
৫৭। বিহারুল আনওয়ার, আল্লামা মাজলিসি, খণ্ড ৪০, পৃ: ১৫।
৫৮। মানাকিবে আলী ইবনে আবি তালিব, পৃ: ৫৫।

হযরত ইমাম আলী (আ.) ইসলামের সর্বপ্রথম আত্মত্যাগী। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সকল সময় হযরত আলীকে সকল বিপদে সামনে রাখতেন। তার মধ্যে সব থেকে প্রসিদ্ধ ঘটনা হল হিজরতের রাতে রাসূলের (সা.) বিছানায় শুয়ে থাকা। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) যখন জানতে পারলেন যে, মক্কার মুশরিকরা তাকে হত্যা করর পরিকল্পনা করেছে তখন তিনি হযরত আলীকে নিজের বিছানায় ঘুমানোর নির্দেশ দিলেন। আর হযরত আলীও কোন অভিযোগ ছাড়াই সাথে সাথে রাসূলের নির্দেশ পালন করলেন এবং রাসূলের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হলেন।

এই ঘটনাটি সকল প্রসিদ্ধ হাদিস ও ইতিহাসের গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। যেমনটি ইবনে হিশাম তার সিরাতুন নাবি গ্রন্থে লিখেছেন: আবু জাহে কুরাইশদের বলল মুহাম্মাদকে শেষ করে দেয়ার জন্য আমার কাছে একটি বড় পরিকল্পনা আছে। তোমাদের সকলকে সেই পরিকল্পনাটিতে গ্রহণ করতে হবে। তারা বলল: কি পরিকল্পনা, হে আবু হাকাম?

আবু জাহেল বলল: আমার সিদ্ধান্ত হল প্রতিটি গোত্র থেকে একজন শক্তিশালী সাহসী ব্যক্তি নির্বাচন করতে হবে যাদের হাতে একটি অতি ধারালো তলোয়ার থাকবে আর চল্লিশ গোত্রর চল্লিশ ব্যক্তি একই সাথে মুহাম্মাদের উপর সেই ধারালো তলোয়ার দিয়ে আঘাত করবে। আর এভাবে সে মারা যাবে এবং আমরাও তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাব। যেহেতু সব গোত্রের লোকেরা একত্রে মুহাম্মাদকে হত্যা করবে তাই আবদে মানাফ (বনি হাশিম) গোত্রের লোকেরা তাদেও সবার সাথে মোকাবেলা করতে পারবে না। ফলে তারা রক্তের মূল্য নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে এবং আমরাও মুহাম্মাদের রক্তের মূল্য পরিশোধ করে দেব।

ইবনে হিশাম বলেন: নাজদি গোত্রের এক বয়স্ক লোক বলল আবু জাহেল ঠিক বলেছে এবং এর থেকে ভাল কোন সিদ্ধান্ত হতেই পারে না। আর তারা সকলে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

বর্ণিত হয়েছে: এরপর হযরত জীব্রাঈল আমিন রাসূলের (সা.) কাছে এসে বললেন: যে বিছানায় আপনি প্রতি রাতে ঘুমান আজ রাতে সেই বিছানায় ঘুমাবেন না।

ইবনে হিশাম বলেন: রাতের অন্ধকার নেমে আসার পর কুরাইশরা রাসুলের বাড়ির দরজার সামে লুকিয়ে অবস্থান নিল এবং অপেক্ষায় থাকল কখন তিনি বিছানা ঘুমাতে যাবেন তখন রাসূলের উপর হামলা করবে। মহানভী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তাদেরকে দেখে হযরত আলীকে বলেন: আজ রাতে তুমি

আমার বিছানায় শুয়ে পড় এবং এই সবুজ হাযরামি চাদর দিয়ে মুড়ি দিয়ে থাকবে। কোন অশুভ চক্রান্ত তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর এটা ঠিক সেই চাদর ছিল যেটা মুড়ি দিয়ে রাসূল (সা.) সবসময় ঘুমাতেন।

ইবনে ইসহাক বলেন: ইয়াযিদ বিন যিয়াদ আমাকে মুহাম্মাদ বিন কাবের হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: যখন কুরাইশরা একত্রিত হয় সেখানে আবু জাহেলও ছিল। আবু জাহেল রাসূলের দরজার সামনে জনগণকে বলল: মুহাম্মাদের কথা হচ্ছে তোমরা যদি তার আনুগত্য কর তাহলে আরব ও আজমের বাদশাহি তোমাদের হবে এবং মৃত্যুর পর আবারও জীবিত হবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর সেখানে তোমাদের বড় বড় ফলের বাগান থাকবে। আর যদি তোমরা তার আনুগত্য না কর তাহলে মৃত্যুর পর জাহন্নামে যাবে এবং সেখানে জাহান্নামের আগুনে আজীবন ধরে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

ইবনে ইসহাক বরেন: রাসূল (সা.) তাদের সামনে দিয়ে বের হলেন এবং নিজের হাতের মুঠোয় মাঠির ঢিলা নিয়ে বললেন: হ্যাঁ, আমি এটাই বলি। আর তুমি হলে সেই জাহান্নামিদের মধ্যে একজন। আর মহান আল্লাহ তাদের চোখের উপর এমন পর্দা দিয়ে দিলেন যে, তারা হযরত মুহাম্মাদকে দেখতে পেলনা এবং তিনি তাদের সামনে দিয়ে তাদের মাথার উপর মাটি ছিড়িয়ে সূরা ইয়াসীন পাঠ করতে করতে চলে গেলেন।

يٰس و القُران الحكيم انَّک لَمن المرسلين على صراط مُّستقيم تنزيل العزيز الرَّحيم

ইয়াসীন, জ্ঞানগর্ভ কুরআনের শপথ। তুমি অবশ্যই প্রেরিত (রসূল)দের অন্তর্ভুক্ত; তুমি সরলপথে প্রতিষ্ঠিত, কুরআন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ।[১]

অন্যরা বলেছেন: তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেছিলেন:

و جعلنا من بين ايديهم سدًّا وَّ من خلفهم سدًّا فاَغشينٰهم فهم لا يبصرون

আর আমি তাদের সামনে একটি প্রাচীর (অন্তরাল) ও তাদের পিছনে একটি প্রাচীর (অন্তরাল) স্থাপন করেছি, অতঃপর আমি তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি, ফলে তারা দেখতে পায় না।[২]

তাদের মধ্যে এমন কেউ ছিলনা যে রাসূল (সা.) তার মাথায় মাটি ছিটিয়ে দেন

৫৯। সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ১-৫।

৬০। সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৯।

নি। অতঃপর রাসূল (সা.) নিজের বাড়ি থেকে রওনা হয়ে চলে গেলেন।
এমন সময় এক লোক দরজার সামনে দাড়ানো লোকদের উদ্দেশে বললেন: কি হয়েছে, তোমরা এখানে কার অপেক্ষা করছ?
সবাই জবাব দিল: আমরা মুহাম্মাদের জন্য অপেক্ষা করছি।
সেই ব্যক্তি বলল: আল্লাহর কসম! মোহাম্মাদ তোমাদের সকল চক্রান্ত ভেস্তে দিয়েছেন এবং তোমাদের সবার মাথায় মাটি দিয়ে চলেগেছেন। দেখ তোমরা কি গাফিলতির মধ্যে রয়েছে?
ইবনে ইসহাক বলেন: তারা সবাই মাথায় হাত দিয়ে দেখল যে, সত্যিই তাদের মাথার উপর মাটি রয়েছে। এরপর ঘরে ঢুকে রাসূলের বিছানায় হযরত আলীকে রাসূলের চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখে বলল: আল্লাহর কসম এটা মুহাম্মাদ। কেননা সে তার চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে। আর এভাবে তারা সারা রাত সেখানে অবস্থান করল। ফজরের সময় যখন হযরত আলী (আ.) উঠলেন, তখন তারা আশ্চর্য হলে বলল: ওই ব্যক্তি ঠিক বলেছিল যে, মুহাম্মাদ আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে চলে গেছে।
ইবনে ইসহাক বলেন: ঐ রাতে কুরাইশরা যে চক্রান্ত করেছিল আল্লাহ তাদের সেই চক্রান্তকে ভেস্তে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

وَ اِذ يَمكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثبِتُوكَ اَوِ يَقتُلُوكَ اَوِ يُخرِجُوكَ وَ يَمكُرُونَ وَ يَمكُرُ اللهُ وَ اللهُ خَيرُ المٰكِرِينَ

আর স্মরণ কর, যখন কাফিরেরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, তোমাকে বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে কিংবা নির্বাসিত করবে। তারাও ষড়যন্ত্র করতে থাকুক এবং আল্লাহও (স্বীয় নাবীকে বাঁচানোর) কৌশল করতে থাকেন, আল্লাহ হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী।[১]
আরও ইরশাদ করেন:

اَم يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِه رَيبَ المَنُونِ قُل تَرَبَّصُوا فَاِنّى مَعَكُم مِنَ المُتَرَبِّصِينَ

তারা কি বলছে, সে (মুহাম্মাদ) একজন কবি? আমরা তার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি। বল, ‘তোমরা অপেক্ষায় থাক! আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষাকারীদের অন্তর্ভুক্ত রইলাম।[২]
ইবনে ইসহাক বলেন: এরপর মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে (মহানবী হযরত

৬১। সূরা আনফাল, আয়াত: ৩০।
৬২। সূরা তুর, আয়াত: ৩০-৩১।

মুহাম্মাদকে) হিজরত করার নির্দেশ দেন।[১]

হযরত আলীর আত্মত্যাগের আরও একটি বড় উদাহরণ হল শিবে আবু তালিবের ঘটনা। যখন কুরাইরা মুসলমানদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট কওে এবং তারা শিবে আবু তালিবে অতি কষ্টে বসবাস করতে বাধ্য হয়। তখন হযরত আবু তালিবের নির্দেশে হযরত আলী নিজের স্থান থেকে উঠে রাসূলের বিছানায় ঘুমাতেন। যাতে রাসূলের জীবনের কোন ক্ষতি না হয়।

আত্মত্যাগের আরও একটি দৃষ্টান্ত হল রাসূল (সা.) এবং দ্বীন ইসলামের হেফাজত করা। সুতরাং এই সকল বিচারে হযরত আলী (আ.) হলেন ইসলামের সর্বপ্রথম আত্মত্যাগী।

১১। আল্লাহর পথের সর্বপ্রথম মুজাহিদ

রাসূলের (সা.) সাহাবাদের মধ্যে আল্লাহর রাস্থায় জিহাদ এবং ত্যাগস্বীকার করার ক্ষেত্রে সব থেকে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণ হলেন, হযরত আলী, হযরত হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব, জাফর বিন আবি তালিব, উবাইদ বিন হারেছ বিন আব্দুল মুত্তালিব, যুবাইর প্রমুখ।

তবে এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলেন হযরত আলী (আ.) যিনি সর্বদা রাসূলের (সা.) সাথে সাথে থাকতেন। সকল যুদ্ধে আল্লাহ তাকে সাহায্য করতেন এবং তিনি কোন যুদ্ধ থেকে পারায়ন করতেন না। তিনি এক আঘাতেই শত্রুতে নিধন করতেন এবং দ্বিতীয় আঘাতের কোন প্রয়োজন হত না।

আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.) ছিলেন ইসলামের ইতিহাসের অতুলনীয় ও শ্রেষ্ঠ বীরযোদ্ধা। আসাদুল্লাহ বা 'আল্লাহর সিংহ' ছিল তাঁর উপাধি। মহানবী হযরত মুহাম্মাদের (সা.) জীবদ্দশায় প্রতিটি যুদ্ধে বিজয়ের তিনিই ছিলেন প্রধান সেনাপতি।

তিনি এমন এক মহান বীর যোদ্ধা যার আগেও এমন কোন পালোয়ান ছিল না এবং তার পরও আর কোন পালোয়ান নেই। যুদ্ধের ময়দানে তার এমন বাহাদুরি ছিল যা কিয়ামত পর্যন্ত নজিরবিহিন দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তিনি এমন এক মহাবীর যিনি কখনোই যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করেন নি এবং কেউ তাকে আঘাত এবং পরাজিত করতে পারে নি। কোন শত্রু সামনে আসলে তাকে দমন করতেন এবং কখনোই তার দ্বিতীয় আঘাত করার প্রয়োজন হত

৬৩। সিরাতুন নাবি, ইবনে হিশাম, খণ্ড ২, পৃ: ১০৮। তারিখে তাবারি, খণ্ড ২, পৃ: ৯৯; আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ইবনে কাছির, খণ্ড৩, পৃ: ২১৬।

না। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে: তিনি (শত্রুকে মাত্র) এটকাই আঘাত করতেন।[১]
সকল ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে স্বীকার করে যে, বদরের যুদ্ধের সব থেকে বড় মুজাহিদ হলেন হযরত আলী (আ.)। যিনি ওয়ালিদ বিন উকবাসহ মুশরিকদের মধ্যে যারা নিহত হয়েছিল তাদের অর্ধেক তিনি একাই হত্যা ছিলেন।
কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বদর অভিমুখে যাত্রা করলেন। এক অসম যুদ্ধে মুসলমানরা জয়ী হল। এ যুদ্ধে সত্তরজন কুরাইশ নিহত হয়। এর মধ্যে ৩৫ জন বড় যোদ্ধা ও গোত্রপতি হযরত আলীর (আ.) হাতে নিহত হয়।
তৃতীয় হিজরিতে কুরাইশরা বদর যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মদিনার দিকে যাত্রা করে। মহানবীও তাদের মোকাবিলা করার জন্য মদিনা থেকে বের হলে দু'দল উহুদ প্রান্তরে পরস্পরের মুখোমুখি হয়। মহানবী (সা.) এ যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বীর হযরত আলীর হাতে ইসলামের পতাকা দিলেন। সে সময় যুদ্ধে ওই ব্যক্তির হাতেই পতাকা অর্পণ করা হতো যে সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা এবং যদি তার হাত থেকে পতাকা পড়ে যেত তবে তারপর যে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা তার হাতে তা দেওয়া হতো। উহুদের যুদ্ধে কুরাইশদের নয় জন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা যারা একের পর এক পতাকা ধারণ করেছিল যারা সবাই হযরত আলীর হাতে নিহত হয় যা কুরাইশদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করে।
ইবনে আবিল হাদিদ লিখেছেন: আল্লাহর রাস্তায় হযরত আলীর যুদ্ধকে শত্রু এবং বন্ধু সকলেই স্বীকার করে। তিনি সকল মুজাহিদদের সর্দার এবং তিনি ছাড়া আর কেউই জিহাদের হক আদায় করতে পারে নি। আমার দৃষ্টিতে রাসূলের (সা.) যুদ্ধসমূহের মধ্যে সব থেকে বড় ও মহান যুদ্ধ এবং মুশরিকদের জন্য সব থেকে কঠিন যুদ্ধ ছিল বদরের যুদ্ধ। যে যুদ্ধে ৭০ জন মুশরিক জাহান্নামে চলে যায় যার অর্ধেক হত্যা করেছিলেন হযরত আলী (আ.)। আর বাকি অর্ধেক হত্যা করেছিল মুসলমানগণ এবং ফেরশেতাগণ। এই বিষয়ে মুহাম্মাদ বিন ওমর ওয়াকেদির গ্রন্থ মাগাজি এবং ইয়াহিয়া ইবনে বালাযুরির তারিখে আশরাফ গ্রন্থ এবং আরও অন্যান্য গ্রন্থ অধ্যায়ন করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। এছাড়াও তিনি, উহুদ, খন্দক, খয়বার ইত্যাদি যুদ্ধে কি পরিমাণ শত্রুদেরকে জাহান্নামে পাঠিয়েছেন তার কোন হিসাবই নাই। আর এই চির সত্য ঘটনার উপর এর চেয়ে বেশী আর কিছু লেখার প্রয়োজন হয় না। কেননা সেটা গোপন করার অর্থ হচ্ছে মক্কা, মদিনা, মিসর ইত্যাদি শহরের নাম গোপন করা যা সবারই জানা আছে। যেভাবে কেউ এই সকল দেশ ও শহরের কথা

৬৪। বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ৪১, পৃ: ১৪৩।

অস্বীকার করা অসম্ভব ঠিক অনুরূপভাবে হযরত আলীর বীরত্ব ও জিহাদের কথা অস্বীকার করাও অসম্ভব।[১]

১২। ইসলামের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক

রাসূল (সা.) তিনজন কাজী (বিচারক) নির্ধারন করেছিলেন আর কখনোই এই তিনজন ছাড়া অন্যদেরকে কাজী বির্ধারন করেন নি। হযরত ইমাম (আ.) আলী (আ.) এ সম্পর্কে বলেন: রাসূল (সা.) আমাকে যখন কাজী বানালেন আমি তখন বললাম: হে আল্লাহর নবী! আপনি আমাকে এমন লোকদের মাঝে পাঠাচ্ছেন যারা আমার থেকে বয়সে বড়। আমি তাদের থেকে বয়সে ছোট এবং আমি বিচার কার্য সম্পর্কে অবগতও নই? (ইমামকে আল্লাহ সকল জ্ঞান দান করেছেন এবং তিনি ইলমে লাদুন্নির মাধ্যমে সকল বিষয়ে অবগত হন। এখানে ইমাম এই কথার মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন যে, আমি সকল বিষয়ের মত এই বিচার বিদ্যাও আপনার কাছ থেকেই শিখেছি। অত্র গ্রন্থের যেখানেই এমন শব্দ আসবে তার অর্থ এটাই হবে। আর একজন ইমাম তাঁর পূর্বের ইমাম, নবী এবং আল্লাহর সামনে নিজেকে ছোট হিসাবে দেখানোর জন্যও এমন কথ বলে থাকতে পারেন।)

রাসূল (সা.) আমার বুকের উপর হাত বুলিয়ে বললেন: আল্লাহ তোমকে দৃঢ় রাখুন এবং তোমাকে সাহায্য করুন। আর যখন দুইজন লোক তোমার কাছে দাবি (বিচার) নিয়ে আসবে। তুমি দুই পক্ষের কথা না শোনা পর্যন্ত সিদ্ধান্ত দিবে না। সঠিক ও সত্য বিচারের জন্য এটা তোমার জন্য অত্যন্ত জরুরী।

ইমাম আলী (আ.) বলেন: এর পর থেকে আমি সর্বদা কজী (বিচারক) ছিলাম।[২]

কাঞ্জুল উম্মাল গ্রন্থে হযরত আলী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: রাসূল (সা.) ইয়েমেন বাসীদের বিচার করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আপিন আমাকে বিচার করার জন্য পাঠাচ্ছেন অথচ আমি বয়সে ছোট এবং বিচার করার অভিজ্ঞতাও নেই। রাসূল (সা.) আমার বুকের উপর হাত মালিশ করে বললেন: হে আল্লাহ এর অন্তরকে হেদায়াত কর এবং এর জিহ্বাকে সত্যভাষী বানিয়ে দাও। তার পর থেকে আজ

৬৫। শারহে নাহজুল বালাগা খণ।ড ১, পৃ: ৪১।

৬৬। গায়াতুল মারাম, সাইয়্যেদ হাশেম বাহরানি, খণ্ড ৫, পৃ: ২৫২।

পর্যন্ত বিচার কার্যে আমার আর কোন সমস্যা হয় নি।[১]

আমরু বিন মাররা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু বাখতারি বলেছেন: এক ব্যক্তি হযরত আলীর কাছে শুনেছেন যে তিনি নিজেই বলেছেন: যখন আল্লাহর নবী আমাকে ইয়েমেনের কাজী বানিয়েছিলেন তখন আমি বলেছিলাম: হে আল্লাহর রাসূল! আপিন আমাকে এই গুরু দায়িত্ব দিয়ে পাঠাচ্ছেন অথচ আমি বয়সে ছোট এবং বিচার করার অভিজ্ঞতাও নেই।

তিনি বলেন: তখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আমার বুকের উপর হাত মালিশ করে বললেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমার অন্তরকে হেদায়াত করবেন এবং তোমার জিহ্বাকে সত্যভাষী বানিয়ে দিবেন। তারপর থেকে বিচার ক্ষেত্রে আমার আর কোন ব্যর্থতা আসে নি এবং সমস্যায় পড়তে হয় নি।[২]

১৩। ইসলামের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি

সকল ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন যে, হযরত আলী (আ.) ইসলামের সর্বপ্রথম সেনাপতি। যিনি ইসলামের সকল যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। শুধুমাত্র তাবুকের যুদ্ধ ছাড়া। কেননা ঐ যুদ্ধে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) হযতর আলীকে মদীনায় নিজের উত্তরাধিকারী হিসাবে নিযুক্ত করে রেখে গিয়েছিলেন।

শেখ মুফিদ বলেন: কুরাইশদের পতাকা সবার আগে কুসাই বিন কালাবের হাতে ছিল। আর তার পর সেটা হযরত আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানদের হাতে পৌঁছায়। যেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত সেই পতাকাধারী সেনাপতির দায়িত্ব পালন করত। আর যখন মহানবীর (সা.) নবুয়্যত ঘোষিত হল তখন কুরাইশ এবং অন্য সকল গোত্রের পতাকা রাসূলের হাতে চলে আসে। আর তিনি সেটাকে কুরাইশদের মধ্যেই রেখে দেন। এই পতাকাকে রাসূল (সা.) বেদানের যুদ্ধে (যাকে আবওয়ার যুদ্ধও বলা হয়) হযরত আলীর হাতে অর্পন করেন। এই যুদ্ধটি বদরের যুদ্ধের পূর্বে আবওয়ায় নামক স্থানে ছিল। কিন্তু সেই যুদ্ধ সংঘটিত হয় নি এবং বানু যুমরা গোত্র বেদান নামক স্থানে সন্ধি করে নেয় যেটা আবওয়া থেকে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত। আর এ জন্যই এই যুদ্ধের নাম বেদান হয়ে যায়। এটাই ছিল ইসলামের প্রথম যুদ্ধে যেখানে রাসূল (সা.) ইসলামের পতাকা উচু করেছিলেন এবং তারপর থেকে সকল যুদ্ধে এই পতাকা ব্যবহার করা হত।

৬৭। কাঞ্জুল উম্মাল খণ্ড ১৩, পৃ: ১২০।

৬৮। মানকিবে আলী ইবনে আবি তালিব, পৃ: ৯০।

বদর এবং ওহুদের মহাযুদ্ধে পতাকা ছিল আব্দুদ দার গোত্রর হাতে। রাসূল (সা.) সেটাকে মুসাইয়্যাব বিন ওমরের হাতে দেন। মুসাইয়্যাব বিন ওমর শহীদ হলে পতাকা মাটিতে পড়ে যায় এবং অন্যান্য গোত্রর লোকেরা পতাকাটি নেয়ার জন্য পিড়াপিড় করতে থাকে কিন্তু রাসূল (সা.) পতাকাটি হযরত আলীর হাতে তুলে দেন। আর সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত ইসলামের পতাকা ও নিশানা বনি হাশিমের হাতেই থাকে।[১]

মুফাজ্জাল বিন আব্দুল্লাহ সামাক থেকে, তিনি আকরামা থেকে এবং তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলীর মধ্যে চারটি এমন বিশেষ বৈশিষ্ট ছিল যা অন্য কারও মধ্যে ছিলনা:

আরব এবং অনারবদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি রাসূলের পিছনে নামাজ আদায় করেছেন, ইসলামের সকল যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। হযরত আলীই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ওহুদের যুদ্ধে সবাই পালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও রাসূলের (সা.) সাথে ছিলেন। হযরত আলীই সেই ব্যক্তি যিনি মহানবীর গোসল, কাফন, জানাজা এবং দাফন করান।[২]

কাতাদা থেকে বর্ণিত হয়েছে হযরত আলী (আ.) বদরের যুদ্ধে এবং ইসলামের অন্য সকল যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।[৩]

সাইয়্যেদ জাফর মোরতাজা আমুলি এমন কয়েকটি দলিল উপস্থাপন করেছেন যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের সকল গাজওয়া এবং যুদ্ধে হযরত আলী (আ.) সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। নিম্নে তার কিছু দলিল উপস্থাপন করা হল:

১। ইবনে আব্বাস বলেন: বদরের যুদ্ধে ইসলামের পতাকা হযরত আলীর হাতে ছিল। আর হাকেম বলেন: ইসলামের সকল যুদ্ধে পতাকা হযরত আলীর হাতে ছিল।

২। মলিক বিন দিনার বলেন: আমি সাইদ বিন জুবাইর এবং তার সকল ভাইদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছি যে মহানবীর যুদ্ধের সেনাপতি কে ছিলেন? তারা সবাই একই জবাদ দিয়েছিলেন যে, রাসূলের সকল যুদ্ধের সেনাপতি হযরত আলী ছিলেন।

অন্য আরেকটি হাদিসে বর্ণিত আছে যে, যখন মালেক সাইদ বিন জুবাইরকে

৬৯। আল ইরশাদ, শেখ মুফিদ, পৃ: ৪২।
৭০। আল ইরশাদ, শেখ মুফিদ, পৃ: ৪২।
৭১। তাবাকাতুল কুবরা খণ্ড ৩, পৃ: ২৩।

জিজ্ঞাসা করল যে কে রাসূলের সেনাপতি ছিলেন তিনি অত্যন্ত রাগন্বিত হন। তখন মালিক তার অন্য ভাইদের কাছে জিজ্ঞাসা করে এবং তারা বলে সে হাজ্জাজকে অনেক ভায় পায় সে জন্য এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চাচ্ছে না। আবারও তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন: রাসূলের সকল যুদ্ধের সেনাপতি হযরত আলী ছিলেন এবং এটা আমি ইবনে আব্বাস থেকে শুনেছি।

মালিক বিন দিনার বলেন: আমি সাইদ বিন জুবাইরকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম ইসলামের সেনাপতি কে ছিলেন: তিনি উত্তরে বলেন, তুমি বিয়াকুফ (বোকা)। অর্থাৎ এমন প্রশ্ন করা বোকাদের কাজ।

মাবাদ জাহনি আমাকে বলেন: সফরের সময় এই পতাকা মাইসারার কাছে থাকত আর যুদ্ধেও সময় পতাকা থাকত হযরত আলীর হাতে।

৩। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, সাহাবারা রাসূলের (সা.) কাছে জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! হাশরের ময়দানে আপনার পতাকাবাহি (সেনাপতি) কে হবেন?

তিনি জবাব দিলেন: আলী যেভাবে দুনিয়াতে আমার সেনাপতি আখিরাতেও সেই আমার সেনাপতি থাকবে।

আর কিছু হাদিসে পতাকার স্থানে নিশান বা আলামতের কথা বলা হয়েছে।

৪। সাদ বিন আবি ওয়াককাস রাস্তায় এক ব্যক্তিকে দেখল যে হযরত আলীকে অপমান করে কথা বলছিল এবং শহরের লোকজন তার চারপাশে জড়ো হয়ে ছিল। সাদ বিন আবি ওয়াককাস সেই ব্যক্তিকে বলল: হে ব্যক্তি! তুমি কেন হযরত আলীর শানে বেয়াদবি করছ? আলী সর্বপ্রথম মুসলমান নন? তিনি কি সর্বপ্রথম রাসূলের (সা.) পিছনে নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি নন? তিনি কি মানুষের মধ্যে সব থেকে যাহেদ (সংযমী) এবং দুনিয়া ত্যাগী নন? তিনি কি সবার চেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি নন? তিনি কি রাসূলের (সা.) সকল যুদ্ধের সেনাপতি নন?

সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের কথা থেকে বোঝা যায় যে, হযরত আলীর (আ.) মধ্যে এই সকল গুণাবলী বিদ্যমান ছিল।

৫। মোকসেম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলের (সা.) পতাকা হযরত আলীর হাতে থাকত। আর আনসারদের পতাকা সাদ বিন ওবাদার হাতে থাকত। আর যখন যুদ্ধ যুবকদের সাথে হত তখন রাসূল (সা.) আনসারদের পতাকার নীচে অবস্থান করতেন।

৬। আম বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলের (সা.) পতাকা সর্বদা হযরত আলীর হাতেই থাকত। আনসারদের মধ্যে কোন নির্দৃষ্ট ব্যক্তি ছিল না।

এখানে হয়ত কেউ বলতে পারে যে, পাঁচ এবং ছয় নম্বর দলিল থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, পতাকা সর্বদা হযরত আলীর হাতেই থাকত এবং এর বাহ্যিক দিক থেকেও প্রমাণিত হয় যে, রাসূলের (সা.) পতাকা সর্বদা হযরত আলীর হাতে থাকত।

৭। ছালাবা বিন আবি মালিক থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সাদ বিন উবাদা সব ক্ষেত্রে রাসূলের (সা.) পতাকাবাহী ছিলেন এবং যুদ্ধের সময় পতাকা হযরত আলীর (আ.) হাতে থাকত।

৮। ইবনে হামজা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, কোন জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তি কি বলতে পারে যে, হযরত আলী (আ.) সেনাবাহনিতে ছিলেন অথচ তিনি সেনাপতি ছিলেন না? মুনাশিদার হাদিসে (মুনাশিদার হাদিস মুলত ওই হাদিসকে বলা হয় যেখানে ওমর দারা গঠিত শুরার মাধ্যমে ওসমানের খলিফা হওয়ার পূর্বে হযরত আলী (আ.) সবার সামেন ইসলামে তাঁর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও ফজিলতের হাদিসসমূহ উল্লেখ করেন এবং সকলেই তা স্বীকার করে নেয়।) কি হযরত আলী (আ.) বলেন নি যে, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর ভয় প্রদর্শন করছি, তোমরা কি বলতে পারবে যে, রাসূলের (সা.) নবুয়্যত ঘোষিত হওয়ার পর আমি ব্যতীত তোমাদের মধ্য থেকে অন্য কেউ কি রাসূলের (সা.) সেনাপতি ছিল?

সকলেই সমশ্বরে জবাব দিয়েছিল: না, আপনি ব্যতীত অন্য কেউ ইসলামের সেনাপতি ছিল না।[১]

এই সমস্ত দলিল থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, হযরত আলী (আ.) হলেন ইসলামের সর্বপ্রথম আলমদার (পতাকাবহী) এবং সকল যুদ্ধে মুসলমানদের সেনাপতি।

১৪। ইসলামের সর্বপ্রথম হাশেমী খলিফা

হযরত আলী (আ.) হলেন সর্বপ্রথম হাশেমী খলিফা বরং হযরত আলীর পূর্বে হাশেমী বংশ থেকে কারও পক্ষে খলিফা হওয়া সম্ভব হয় নি। যে সকল বৈশিষ্ট, ফজিলত ও পূর্ণতা হাশেমী বংশের শ্রেষ্ঠত্বে ও প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণ ছিল তার সবই হযরত আলীর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এছাড়াও তাঁর মহান পিতা হযরত আবু তালিব, দাদা হযরত আব্দুল মুত্তালিব এবং পরদাদা হযরত হাশেম ছিলেন কুরাইশদের নেতা ও সর্দার।

৭২। সহীহ মিন সিরাতিন নাবিইল আযাম, খণ্ড ৭, পৃ: ৯৯।

তাঁর মা ছিলেন ফাতিমা বিনতে আসাদ বিন হাশেম। আর তিনি ছিলেন সেই মহান মোমেনা নারী যার পূর্বপুরুষদের সকলেই মুসলমানদের মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন। আর হযরত আমিনার মৃত্যুর পর তিনিই মহানবী হযরত মুহাম্মাদকে (সা.) নিজের কোলে-পিঠে লালন-পালন করেন। আর তখন হযরত মুহাম্মাদের (সা.) বয়স ছিল মাত্র ৬ বছর।

আর এই হাশেমী খেলাফত হযরত আলীর (আ.) পর হযরত ইমাম হাসানের (আ.) কাছে পৌঁছায়।

১৫। ইসলামের সর্বপ্রথম লেখক

ইসলামে সর্বপ্রথম যিনি কিতাব (গ্রন্থ) লেখেন তিনি হলেন হযরত আলী (আ.)। আর নাহজুল বালাগা যেটা সাইয়্যেদ শারীফ রাজি সংকলন করেছেন তিনি হযরত আলীর (আ.) খোতবা, ভাষণ, চিঠি, হিকমত এবং অমীয় বাণী থেকে সংকলন করেছেন। আর এই নাহজুল বালাগা হযরত আলীর একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে পরিণত হয়েছে।

ইতিহাসে কিতাবুল ফারায়েজ নামেও একটি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই গ্রন্থটিও হযরত আলী লিখেছেন যেটাকে আবার ফরায়েজে ইমাম আলীও বলা হয়। এই গ্রন্থটি পরবর্তী মাসূম ইমামগণের কাছেও ছিল এবং তাঁর বিশ্বস্ত ছাত্র ও সাহাবারাও সেখান থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

হযরত আলী (আ.) মালেক আশতারকে মিশরের গভর্ণর নিযুক্ত করে তাকে যে চিঠি লেখেন সেটাও তাঁর অতি প্রসিদ্ধ একটি লেখনি হিসাবে পরিচিত। আর এই চিঠিটি একটি আদর্শ রাষ্ট্র পরিচালনা করার একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

আলী ইবনে রাজেহ একটি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন ওই গ্রন্থের লেখক হলেন হযরত আলী (আ.) যার মধ্যে ফিকাহ শাস্ত্রের বিভিন্ন মাসলা মাসায়েল বর্ণিত হয়েছে। নাসাঈ মুসনাদে ইমাম আলী নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন যার মধ্যে হযরত আলীর (আ.) বাণী এবং হাদিস রয়েছে। এগুলো ছাড়াও ইতিহাসে হযরত আলীর আরও অনেক গ্রন্থ এবং লেখনির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন: কিতাবে আলী, আল জামে ইত্যাদি।

১৬। আরবী ব্যকরণের জনক

সকল ঐতিহাসিকদের মধ্যে এটা প্রসিদ্ধ যে, সর্বপ্রথম ইলমে নাহু তথা আরবী ব্যকরণের জনক হলেন হযরত আলী (আ.)। আরবী ব্যবকরণের সকল নিয়ম

কানুন হযরত আলীই সর্বপ্রথম বর্ণনা করেন। অতঃপর আবুল আসওয়াদে দোয়েলী (জালিম বিন আমরু) হযরত আলী থেকে আরবী ব্যবকরণ শিক্ষালাভ করে সেটাকে আরও বেশী সুসজ্জিত করেন। এরপর থেকে সেটাকে ইলমে নাহু তথা আরবী ব্যকরণ বলা হয়।

সাইয়্যেদ মোহসেন আমিন (রহ.) বলেন:

সকল মুহাদ্দিস ও পণ্ডিতগণ স্বীকার করেছেন যে, হযরত আলী (আ.) হলেন আরবী ব্যকরণের জনক। তিনি ব্যবকরণের সকল ভিত্তি এবং নিয়মকে আবুল আসওয়াদে দোয়েলীকে শিক্ষা দেন। তিনি তাবেয়ী ছিলেন এবং হযরত আলীর নির্দেশ এবং প্রশিক্ষ অনুযায়ী তিনি আরবী ব্যকরণের ভিত্তি নির্মন করেন।[১]

তিনি আরও বলেন: সত্য তো এটাই যে, হযরত আলী (আ.) হলেন আরবী ব্যকরণের জনক। কেননা এই সংক্রান্ত সকল হাদিস থেকে দেখা যায় যে তা আবুল আসওয়াদে দোয়েলী পর্যন্ত পৌছাচ্ছে আর আবুল আসওয়াদ এই বিদ্যা শিখেছিলেন হযতর আলী থেকে। আবুল আসওয়ারেদ াকছে জিজ্ঞাসা করা হল: আপনি আরবী ব্যবকরণ কার কাছ থেকে শিখেছেন? তিনি উত্তওে বলেন: আমি এই বিদ্যার সকল আদ্যপান্ত হযরত আলীর (আ.) কাছ থেকে শিখেছি। আর আবুল আসওয়াদে দোয়েলী থেকে যারা ব্যকরণ শিখেছেন তারা হলেন: আনবাসাতুল ফিল, মাইমুন আকরান, নাসর বিন আসেম, আব্দুর রহমান বিন হোরমুজ এবং ইয়াহিয়া ইবনে ইয়ামোর প্রমুখ।

ইবনে নাদিম বলেন: কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি বলেছেন যে, নাসর বিন আসেম আবুল আসওয়াদে দোয়েলী থেকে ইলমে নাহু (আরবী ব্যকরণ) শিখেছেন। ইয়াকুত তার বাগিয়াতুল ওয়াত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, আসেম ইলমে নাহু এবং কোরআন শিখেছেন আবুল আসওয়াদ থেকে।

সিবেভেই এর খোতবার ব্যাখ্যায় আবুল আনওয়ারি বলেন,

انَّ اللّٰه برِیٓءِ من المشرکین و رسولُه

নিশচয়! আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়মুক্ত এবং তাঁর রাসূলও।[২]

যখন রাসূলের যুগেই কোন ব্যক্তি রাসূলুহু না পড়ে রাসূলিহি পড়ে তখন রাসূল (সা.) হযরত আলীকে বলেন: তুমি ইলমে নাহু তথা অরবী ব্যকরণ লেখা শুরু কর। এরপর হযরত আলী (আ.) আবুল আসওয়াদে দোয়েলীকে আরবী ব্যকরণের আদ্যপান্ত শিক্ষা দেন এবং এভাবেই ইলমে নাহু তথা আরবী

৭৩। আইয়ানুশ শিয়া, সাইয়্যেদ মোহসেন আমিন, খণ্ড ১, পৃ: ২৩০।

৭৪। সূরা তাওবা, আয়াত-৩।

ব্যকরণের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। আর যখনই আবুল আসওয়াদ এই সংক্রান্ত কোন সমস্যায় পড়তেন তখন তিনি হযরত আলীর কাছে যেতেন এবং সমস্যার সমাধান নিয়ে নিতেন। আবুল আসওয়াদ যখন আরবী ব্যকরনের সকল বিষয় পরিপূর্ণ করে হযরত আলীর কাছে উপস্থাপন করেন, তখন হযরত আলী তার প্রশংসা করে বলেন: সর্বোত্তম নাহু এবং পদ্ধতি। আর হযরত আলীর এই বাক্য থেকেই আরবী গ্রামারের নাম হয়েছে ইলমে নাহু। হাদিসটি খবারে ওয়াহিদ এবং সন্দেহ জনক। কেননা রাসূলের যুগে আরবদের আরবী ভাষায় কোন ভুল হত না। আরবী ভাষায় ভুল উচ্চারণ করা আরবদের মধ্যে অনরারবদের প্রবেশের পর শুরু হয়।[১]

আল্লামা কাফতি তার আনবাহুর রেওয়াত আলা আনবাহুন নেজাত গ্রন্থে বলেন: সকল মিসরবাসী ঐক্যমত্য পোষণ করেন যে, সর্বপ্রথম আরবী ব্যকরণ হযরত আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহু আবিস্কার করেন। তাঁর থেকে আবুল আসওয়াদ শিখেছেন, তার থেকে নাসর বিন আসেম বাসরী, তার থেকে আবু আমরু বিন আলা বাসরি, তার থেকে খালিল বিন আহমাদ, তার থেকে সিবেভেই আবু বেশর ওমার বিন ওসমান বিন কাম্বার, তার থেকে আবুল হাসান সাইদ বিন মাসয়াদাহ খাফশ আওসাত, তার থেকে ওসমান বাকর বিন মোহাম্মাদ মাযানি শাইবানি, আর তাদের থেকে আবু আব্বাস মুহাম্মাদ বিন ইয়াযিদ মেবোরদিনি, তার থেকে আবু ইসহাক জোযাজ এবং আবু বাকর বিন সিরাজ এবং ইবনে সিরাজ থেকে আবু আলী হাসান বিন আব্দুল গাফফার ফারসি, তার থেকে আলী ইবনে ঈসা রাবেয়ী, তার থেকে আবু নাসর কাসেম বিন মোবাশের ওয়াসেতি, তার থেকে তাহের বিন আহমাদ বিন শাযি মিসরি, তার থেকে আবু জাফর নাহাস আহমাদ বিন ইসমাঈল মিসরি, তার থেকে আবু বকর আদফু, তার থেকে আবু হাসান আলী ইবনে ইব্রাহীম হাওফি, তার থেকে তাহের বিন আহমাদ বিন বাবাশায নাহভি, তার থেকে আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন বারাকাত নাহভি মিসরি, তার থেকে এবং আরও অন্যান্য ব্যকরণবিদদের থেকে মুহাম্মাদ বিন বারি আর তার থেকে মিশর, মরোক্ক এবং আরও অন্যান্য দেশের কিছু আলেম ইলমে নাহু তথা আরভী ব্যবকরণ শিক্ষালাভ করেছেন। আর এই বিদ্যাকে আরও বেশী সুন্দর ও উন্নতি সাধন করেছেন আমর বিন আস বিশ্ববিদ্যালয়ের শেইখ আবু হাসান নাহভি। যিনি ৬২০ হিজরিতে ইন্তিকাল

৭৫। আইয়ানুশ শিয়া, সাইয়্যেদ মোহসেন আমিন, খণ্ড ১, পৃ: ২৩৩।

করেন।[১]

ইবনে আবিল হাদিদ মোতাযেলী ইলমে নাহু প্রতিষ্ঠায় হযরত আলীর ভূমিকা সম্পর্কে বলেন: অন্যান্য বিদ্যার মত ইলমে নাহুও একটি বিদ্যা। আর এটা সকলের জানা আছে যে, ইলমে নাহুর প্রতিষ্ঠাতা হলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব। আর তিনিই আবুল আসওয়াদে দোয়েলীকে এর সকল ভিত্তি ও পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। আর এর মধ্যে অন্যতম একটি ভিত্তি হল প্রতিটি শব্দ তিনটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত:

ইসম, ফেয়ল এবং হরফ (নাম, ক্রিয়া এবং অক্ষর)। আর প্রতিটি কালেমা তথা শব্দ মারেফা এবং নাকারা দুই ভাগে বিভক্ত। এরপর বিভিন্ন এরাবের (হরকতের) শিক্ষা দিয়েছেন এবং বলেছেন তা হল রাফ, নাসব, জার এবং জাযম (পেশ, যবর, যের এবং জযম বা সাকিন)। আর বিদ্যার এই গভীরতা কোন মোজেযা থেকে কম কিছু নয়। কেননা সাধারন মানুষের চিন্তা ওই পর্যন্ত পৌছায় না এবং তাদের মধ্যে এটা প্রমাণ ও আবিস্কার করার যোগ্যতাও থাকে না।[২]

হযরত আলী (আ.) কেন ইলমে নাহু প্রতিষ্ঠা করেন? আবুল আসওয়াদে দোয়েলী এর কারণ উল্লেখ করে বলেন: একদা আমি হযরত আলীর (আ.) কাছে হাজির হয়ে দেখলাম তিনি মাথা নিচু করে গভীর চিন্তায় মগ্ন আছেন। আমি প্রশ্ন করলাম: হে মাওলা! আপনি কি চিন্তায় মশগুল আছেন?

ইমাম জবাব দিলেন: তোমাদের শহরের লোকেরা এখন আরবীতে অনেক ভুল করছে। আমি তাদের ভুলভ্রান্তি দূর করার জন্য আরবি নিয়ম ও পদ্ধতি তৈরি করেছি। আমি তখন বললাম: হে ইমাম! আপনার এই অবদানের কারণে আরবী ভাষা প্রাণ ফিরে পাবে। এই ঘটনার কিছুদিন পর আমি যখন মাওলার খেদমতে হাজির হলাম তখন ইমাম আমার সামনে একটি সহিফা তথা বই রাখলেন যার প্রথমেই লেখা ছিল:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, প্রতিটি বাক্য ইসম, ফেয়ল এবং হযরফ দিয়ে গঠিত হয়। ইসম এমন একটি জিনিস যা কোন ব্যক্তিকে বোঝায়। ফেয়ল ওই ব্যক্তির কাজ ও ক্রিয়াকলাপকে বুঝায়। আর হরফ এমন একটি অর্থ দেয় যা নামও না আবার ক্রিয়াও না। এরপর ইমাম বললেন: এগুলোকে ভালভাবে বোঝার চেষ্টা কর। আর যা কিছু এর সাথে সংযুক্ত করা যায় তা তুমি নিজেই

৭৬। শারহে এহকাকুল হাক, সাইয়্যেদ মারআশী নাজাফি, খণ্ড ৮, পৃ: ১০।

৭৭। শারহে নাহজুল বালাগা, ইবনে আবিল হাদিদ, খণ্ড ১, পৃ: ৩৮।

কর।

আর মনে রেখ দুনিয়ার সকল জিনিস হয় জাহির বা প্রকাশ্য অথবা মুজমির বা অপ্রকাশ্য এবং তৃতীয়টি হল না প্রকাশ্য না অপ্রকাশ্য। আর আলেমদের মতপার্থক্যও এই বিষয়টির উপর ছিল যা না প্রকাশ্য আর না অপ্রকাশ্য। আর এজন্যই আমি দুনিয়ার সমস্ত কিছুকে একত্রিত করে এই তিনিটি ভাগে বিভক্ত করেছি এবং তার ভিত্তিতে সব কিছু স্পষ্ট করেছি। আর হুরুফে নাসব এমন একটি তৃতীয় ভাগ যা তারই মধ্যে রয়েছে। আমি নাসব তথা যবরকে বোঝানোর জন্য ইন্না, আন্না, লাইতা এবং লাআল্লা (إن ، أن ، ليت و لعل) ব্যবহার করলাম। ইমাম বললেন: ঠিক আছে কিন্তু লাকিন্না-কে (لكن) তুমি বাদ দিলে কেন? আমি বললাম: আমি বুঝতে পারি নি যে এটাও এখানে শামিল তথা অন্তর্ভূক্ত হবে। তখন ইমাম বললেন: এটাও নাসব তথা যবরের অন্তর্ভূক্ত এটাকে তার মধ্যে নিয়ে আস।[১]

আবুল বারাকাত আম্বারি তার নুযহাতুল আউলিয়া গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আবুল আসওয়াদ দোয়েলী বলেছেন: আমি আমিরুল মুমিনিন হযরত আলীর কাছে উপস্থিত হয়ে ওনার পবিত্র হাতে একটি কাগজ দেখতে পেলাম। প্রশ্ন করলাম এটা কি?

ইমাম বললেন: আমি লোকজনের কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারলাম যে, আজম তথা অনারবদেও সাথে মেশার কারণে তাদের ভাষাগত সমস্যা দেখা দিয়েছে। কাজেই আমি এই সমস্যা সমাধানের জন্য এমন পদ্ধতি আবিস্কার করেছি যা সবাই অনুসরণ করতে পারবে। অতঃপর তিনি ওই কাগজ আমার হাতে দিলেন যাতে লেখা ছিল: বাক্য كلام তিনিটি জিনিসের সমন্বয়ে গঠিত হয় যথা: ইসম, ফেয়ল এবং হরফ (اسم، فعل و حرف)। আর ইসম নামের প্রতি ইঙ্গিত করে, ফেয়ল ক্রিয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে এবং হরফ দুই শব্দের মধ্যে অর্থ প্রদান করে। অতঃপর ইমাম বললেন: এই নাহু এবং পদ্ধতির উপর চল এবং এর নিয়ম ও পদ্ধতিসমূহকে বৃদ্ধি করতে থাক। আর হে আবুল আসওয়াদ এটাও মনে রেখ: ইসম হচ্ছে তিন প্রকার যথা: প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য এবং প্রকাশ্য নয় এবং অপ্রকাশ্যও নয়। মানুষ এই তৃতীয়টা নিয়ে মতপার্থক্যে পড়ে যায়। আর এই তৃতীয়টি বলতে ইমাম জটিল এবং অস্পষ্ট নামকে বুঝিয়েছেন।

আবুল আসওয়াদ বলেন: এরপর আমি আতফ, নায়ত (সিফাত), তায়াজ্জোব,

৭৮। শারহে এহকাকুল হাক, সাইয়্যেদ মারআশী নাজাফি, খণ্ড ৮, পৃ: ১১।

ইসতিফহামের বিষয়সমূহ স্পষ্ট করলাম। অতঃপর লাকিন্না (لكن) ছাড়া সকল হুরুফে মুশাব্বাহ বিল ফেয়ল (حروف مشبه بالفعل) বর্ণনা করলাম। আর যখন আমি এগুলোকে ইমামের কাছে উপস্থাপন করলাম ইমাম আমাকে (لكن) যুক্ত করার কথা বললেন। এভাবে আমি যখনই ইলমে নাহুর নতুন কোন অধ্যায় লিখতাম সাথে সাথে ইমামের কাছে নিয়ে যেতাম যাতে কওে তার মধ্যে কোন ধরনের ভুলভ্রান্তি অবশিষ্ট না থাকে। সকল নিয়ম ও পদ্ধতি দেখার পর ইমাম বললেন: সর্বোত্তম নাহু এবং পদ্ধতি এরপর থেকে এই বিদ্যার নাম হয়ে গেল ইলমে নাহু।[১]

আমিরুল মুমিনিন হযরত আলী (আ.) হলেন ইলমে নাহু তথা আরবী ব্যকরণের প্রতিষ্ঠাতা, এসম্পর্কে বহু হাদিস এবং অসংখ্য দলিল রয়েছে। আর উপরোক্ত দলিলও তা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। কেননা এই বিষয়টিও শিয়া-সুন্নি সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে।

১৭। ইলমে কালামের (কালামশাস্ত্রের) জনক ও প্রতিষ্ঠাতা

ইলমে কালাম হল সেই জ্ঞান যার মাধ্যমে ইসলামী আকিদা-বিশ্বাসকে চূড়ান্ত দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণ করা হয়।

ইলমে কালামে ইসলামের আকিদাগত বিষয়ের স্বপক্ষে দলিল উপস্থাপন করা হয় এবং তা প্রমাণ করা হয়। আর এর বিরোধীদের দৃষ্টিভঙ্গির উপর আলোচনা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিরোধীদের দলিলকে দূর্বল ও বাতিল বলে প্রমাণ করা হয়। এছাড়াও ইসলামী আকিদার উপর আরোপিত সকল আপত্তি ও সমস্যার উপযুক্ত ও বস্তুনিষ্ঠ জবাব দেয়া হয়।[২]

ইলমে কালামের সকল নিয়ম ও পদ্ধতি সর্বপ্রথম হযরত আলী (আ.) আবিস্কার করেন। যেভাবে উসূলে দ্বীন তথা তাওহীদ, আদালাত, নবুয়্যত, ইমামত এবং কিয়ামতের উপর নাহজুল বালাগা এবং আরও অন্যান্য হাদিসের গ্রন্থে তাঁর বহু খোতবা বিদ্যমান রয়েছে।

সাইয়্যেদ মোর্তাজা এসম্পর্কে বলেন:

তাওহীদ এবং আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতার বিষয়টির উৎপত্তি এবং উৎস হল হযরত আলীর বাণী এবং খোতবাসমূহ। ইমামের খোতবাসমূহে তাওহীদ এবং

৭৯। শারহে এহকাকুল হাক, সাইয়্যেদ মারআশী নাজাফি, খণ্ড ৮, পৃ: ১১।

৮০। ইলমে কালাম, ড.আব্দুল হাদি ফাজলি, পৃ: ৩৩।

আদালাতের উপর এত উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা করা হয়েছে যার পর আর বেশী কোন আলোচনার দরকার হয় না। কাজেই কেউ যদি হযরত আলীর বাণী এবং খোতবার উপর গুরুত্বারোপ করে তাহলে সে বুঝতে পারবে যে, যত আলিম এবং মুতাকাল্লিমগণ এই বিষয়ের উপর বই লিখেছেন তারা সবই হযরত আলীর বাণীর ব্যাখ্যা তাঁর প্রনীত ভিত্তির ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই না।[১]

ইবনে আবিল হাদিদ বলেন: জ্ঞানের মধ্যে সব থেকে বড় ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হচ্ছে ঐশী জ্ঞান। কেননা কোন জ্ঞানের গুরুত্ব সেই জ্ঞানের মূলভাব থেকে বোঝা যায়। আর ইলমে কালামের ভাবার্থ ও শিক্ষা সৃষ্টিজগতের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর এই জ্ঞানের উৎপত্তি মাওলা আলীর বাণী ও কথা থেকে হয়েছে। এই জ্ঞান হযরত আলী থেকেই শুরু এবং তাঁর কাছেই শেষ হয়েছে। যেভাবে মোতাযেলারা তাওহীদ এবং আদালাতে বিশ্বাসী এবং তারা আকল তথা বিচার-বুদ্ধি পন্থি। লোকজন এই জ্ঞানকে মোতাযেলা আলেমদেও থেকে শিখেছে। মোতাযেলা সম্প্রদায়ের রূপকার হচ্ছে ওয়াসেল বিন আতা। আর সে হচ্ছে আবু হাশেম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়া ছাত্র। আর আর আবু হাশেম হচ্ছে নিজের পিতার ছাত্র। আর তার পিতা হচ্ছে হযরত আলী ইবনে আবি তালিবের ছাত্র।

আশাারিরা নিজেদের আকিদাকে আবুল হাসান বিন ইসমাইল বিন আবু বাশার আশআরি থেকে গ্রহণ করেছে। আর আবু আলী হচ্ছে জাবাইর ছাত্র। আর আবু আলীকে মুতাযেলা ফিরকার প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হিসাবে উল্লেখ করা হয়। সুতরাং আশআরি ফিরকার উৎসও মুতাযেলা সম্প্রদায়ের মত হযরত আলীর কাছেই পৌছায়। আর ইমামিয়া এবং যাইদিয়া সিলসিলা যে হযরত আলীর সাথে সম্পর্কিত তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।[২]

একারণেই কেউ যদি হযরত আলীর আকিদা সংক্রান্ত খোতবা এবং বাণী অধ্যায়ন করে তাহলে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, ইলমে কালামের প্রতিষ্ঠাতা হলেন হযরত আলী। আর ওনার পূর্বে কেউই এ বিষয়ে কাজ করে নি।

১৮। ইসলামী হুকুমত তথা শাসনব্যবস্থার জনক ও প্রতিষ্ঠাতা

আমিরুল মুমিনিন হযরত আলী (আ.) মিশরের গভর্ণর মালিক আশতারকে যে চিঠি লিখেছিলেন সেটা হল রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি পরিপূর্ণ

৮১। আমালি সাইয়্যেদ মোর্ত্তাজা, খণ্ড ১, পৃ: ১৬৩।

৮২। শারহে নাহজুল বালাগা, ইবনে আবিল হাদিদ, খণ্ড ১, পৃ: ৩৫।

সংবিধানস্বরূপ। হযরত আলী (আ.) এই চিঠিতে একজন গভর্ণরের দায়িত্ব সম্পর্কে লিখেছিলেন। যেমন: প্রজাদের সাথে নম্র আচরণ করা, দরিদ্র ও অসহায়দের সাহায্য করা, প্রজাদের সাথে সদাচার করা, অসচ্ছল প্রজাদের সমস্যার সামাধান করা, দ্বীনি ও শরীয়তের দায়িত্ব পালন করা, সহচরদের প্রতি বিশেষ নজদারী করা ইত্যাদি যা হচ্ছে মানুষের হেদায়েত এবং রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য পরিপূর্ণ একটি সংবিধান।

এই চিঠিতে ইমাম আলী (আ.) মালিক আশতারকে গভর্ণরের গুণাবলী ও দায়িত্ব, সর্বসাধারণের স্বার্থে প্রশাসন, উপদেষ্টা নিয়োগ, বিভিন্ন শ্রেণীর লোক, সেনাবাহিনী, বিচারপতি, নির্বাহী অফিসার, রাজস্ব প্রশাসন, কর্মচারীদের সংস্থাপন, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি, নিম্ন শ্রেণীর লোক, আল্লাহর ধ্যান এবং শাসকের আচরণ ও কর্ম সম্পর্কে নির্দেশনা দান করেন।

গভর্ণরের দায়িত্ব ও গুণাবলী সম্পর্কে বলেন: হে মালিক! মনে রেখ, আমি তোমাকে এম নএক এলাকায় পাঠাচ্ছি যেখানে তোমার পূর্বেও সরকার ছিল। তাদেও কেউ কেউ ছিল ন্যায়পরায়ণ আবার কেউ কেউ ছিল অত্যাচারী। জনগণ এখন তোমার কর্মকাণ্ড নিরিখ করবে। যেভাবে তুমি তোমার পূর্ববর্তী শাসকগণকে নিরিখ করতে। আর তারা তোমার সমালোচনা করবে যেভাবে তুমি পূর্ববর্তী শাসকগণের সমালোচনা করেছিলে। নিশ্চয়ই দ্বীনদাগণেরের পরিচয় পাওয়া যায় তারেদ খ্যাতির মাধ্যমে যা আল্লাহ তাঁর বান্দাগণের জিহ্বা দ্বারা ছড়িয়ে দেন। সুতরাং তোমার ভাল কর্মকাণ্ডই তোমার সর্বোত্তম সঞ্চয়।

সর্বসাধারণের স্বার্থে প্রশাসন সম্পর্কে বলেন: হে মালিক! মনে রেখ, তোমার এমন পথ অবলম্বন করা উচিত হবে যা সাম্য ও ন্যায় ভিত্তিক। যা হবে ন্যায়বিচারকের পক্ষ থেকে সর্বজনীন এবং যা তোমার অধীনস্ত সকলেই একবাক্যে গ্রহণ করবে। কারণ জনসাধারণের মধ্যে কোন ব্যবস্থা সম্পর্কে দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকলে তা নেতার যুক্তি-তর্ককে খর্ব কওে দেয়।

উপদেষ্টা নিয়োগ সম্পর্কে বলেন: হে মালিক! মনে রেখ, কখনো কোন কৃপণ ও কাপুরুষকে উপদেষ্টা হিসাবে গ্রহণ করবে না। কারণ কৃপণ তোমাকে ঔদার্যপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং আর্থিক অনটনের ভয় দেখাবে। আবার কাপুরুষ তোমর কর্মকাণ্ডে তোমাকে নিরুৎসাহীত করবে এবং আদেশ-নির্দেশ কার্যকর করতে দুর্বল করে তুলবে। একইভাবে কোন লোভী ব্যক্তিকেও উপদেষ্টা করো না। তারা অন্যায়ভাবে কর আদায় করে সম্পদের প্রাচুর্য তোমাকে দেখাবে। কৃপণতা, কাপুরুষতা এবং লোভ ভিন্ন ভিন্ন দোষ হলেও এগুলো কিন্তু আল্লাহর প্রতি ভুল ধারণা সম্পর্কে অভিন্ন।

বিভিন্ন শ্রেণীর লোক সম্পর্কে বলেন: হে মালিক! জেনে রেখ, জনগণ বিভিন্ন শ্রেণীর হলেও একে অপরের সহায়তা ছাড়া উন্নতি লাভ করতে পারে না এবং তারা কেউ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাদের মধ্যে আল্লাহর পথে নিয়োজিত সৈনিকত রয়েছে, বিভাগীয় প্রধান ও জনগণের সচিবালয়ের কর্মচারী রয়েছে, ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য বিচারক রয়েছে, আশ্রিত মুসলিম ও অমুসলিমদেও মধ্যে হতে জিজিয়া ও খারাজ প্রদানকারী অনেকেই রয়েছে, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি রয়েছে এবং দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্ত রয়েছে। আল্লাহ তাদের প্রত্যেকের হিস্যা ও সীমা তাঁর কুরআনে এবং তার রাসূলের সুন্নাহয় নির্ধারিত করে দিয়েছেন যা আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে।

সেনাবাহিনী সম্পর্কে বলেন: হে মালিক! মনে রেখ, এমন লোককে তোমার সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব অর্পণ করবে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তোমর ইমামের প্রতি সবচেয়ে বেশী আনুগত্য রাখে ও তাদের শুভাকাঙ্খী। সেনাবাহিনীর নেতাদেও মধ্যে সেই সবথেকে সৎ ও ধৈর্যশীর যে, অন্যায় ছাড়া কাওকে আক্রমণ করে না এবং দুর্বলের প্রতি সদয় এবং সবলেল প্রতি নমনীয় নয়।

বিচারপতি সম্পর্কে বলেন: হে মালিক! মনে রেখ, জনগণের মধ্যে বিরোধ নিস্পত্তির জন্য তোমার মতে প্রজাগণের মধ্যে যে ব্যক্তি সবচাইতে সম্মানিত তাকে বিচারক মনোনীত কর। তার সামনে যেসব মামলা আসবে তাতে সে যেন ক্ষিপ্ত না হয় এবং বিরোধের বিষয়ে সে যেন উত্তেজিত না হয়। কোন ভুল বিষয়ে সে যেন জেদ না ধরে এবং যখন সে সত্য বিষয় বুঝতে পাওে তখন যেন তা গ্রহণ করতে অসম্মত না হয়।

মাঝে মধ্যে তার রায় পরীক্ষা করে দেখ এবং তাকে সে পরিমাণ অর্থ পারিশ্রমিক দেবে যাতে সে অসৎ অবার জন্য কোন ওজর দেখাতে না পারে।

নির্বাহী অফিসার সম্পর্কে বলেন: হে মালিক! মনে রেখ, নির্বাহী অফিসারদের কর্মকাণ্ডের প্রতি নজর দিয়ো। পরীক্ষা-নিরিক্ষা কওে তাদেরকে নিয়োগ কর। কখনো স্বজন-প্রীতি ও কাউকে আনুকুল্য প্রদর্শন করে তাদের নিয়োগ দিয়ো না। কেননা এদুটি জিনিস অবিচার ও অন্যায়ের উৎস। অভিজ্ঞ ও বিনয়ী দেখে তাদেও নিয়োগ কর। যারা ধার্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে এবং পূর্বে ইসলাম ধর্মে ছিল তারা অকলঙ্কিত সম্মানে অধিকারী। তারা লোভের বশবর্তী হয় না এবং সর্বদা কো নবিষয়ের পরিণামের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখে।

রাজস্ব প্রশাসন সম্পর্কে বলেন: হে মালিক! মনে রেখ, রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে রাজস্ব প্রদানকারীগণ যে তাদের সম্পদে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

কারণ রাজস্ব দাতাদের উন্নতির উপরই সমাজের অন্য সকলের উন্নতি নির্ভরশীল। রাজস্ব আদায় অপেক্ষা চাষাবাদের প্রতি তোমাকে বেশী নজর দিতে হবে। কারণ চাষাবাদ ছাড়া রাজস্ব আদায় করা সম্ভভ নয় এবং চাষাবাদ ছাড়া রাজস্ব দাবী করা মানেই জনগণকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া।

কর্মচারীদের সংস্থাপন সম্পর্কে বলেন: হে মালিক! তৎপর কর্মচারীদের প্রতি যত্নবান হয়ো। তাদের মধ্যে যে সর্বোত্তম তাকে তোমার কাজকর্ম চালাবার ভার দিয়ে দিয়ো।

ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি সম্পর্কে বলেন: হে মালিক! মনে রেখ, তারা দোকানদার হোক, ব্যবসায়ী হোক আর কায়িক শ্রমিক হোক তাদেরকে ভাল উপদেশ দিয়ো। কারণ তারা লাভের উৎস এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের যোগানদার।

নিম্ন শ্রেণীর লোক সম্পর্কে বলেন: হে মালিক! মনে রেখ, এরা হল সেই শ্রেণীর যারা গরীব, দুঃস্থ, কপর্দকহীন ও আঁতুর। এশ্রেণী দুভাগে বিভক্ত একদল অতৃপ্ত অন্যদল ভিক্ষুক। এদের প্রতি আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করতে যত্নবান হয়ো। তা না করলে আল্লাহর কাছে তুমি দায়ি থাকবে। তাদেও জন্য সরকারী কোষাগার হতে ভাতা নির্ধারণ করে দিয়ো এবং যা যুদ্ধলব্ধ হয় তা থেকে একটা অংশ নির্ধাণ করে দিয়ো।

আল্লাহর ধ্যান সম্পর্কে বলেন: হে মালিক! মনে রেখ, যেসব বিশেষ কাজ দ্বারা তুমি তোমার দ্বীনের পবিত্রতা অর্জন করতে পারবে তা হলো আল্লাহর প্রতি তোমার বিশেষ দায়িত্বগুলো পালন ও পূর্ণ করা। সুতরাং দিনে ও রাতে কিছু শারীরিক কসরত দ্বারা আল।রাহর ধ্যানে মগ্ন হয়ো। তুমি আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য য কিছু কর না কেন তা হতে হবে পরিপূণ, ত্রুটিবিহীন ও ঘাটতিবিহীন। এটা করতে যতোই শারীরিক কষ্ট হোক না কেন তাতে পিছ পা হয়ো না।

শাসকের আচরণ ও কর্ম সম্পর্কে বলেন: হে মালিক! দীর্ঘ সময় ব্যপী নিজেকে জনগণ হতে দূওে সরিয়ে রেখো না। কারণ যারা প্রশাসনের কর্তৃত্ব প্রাপ্ত তারা জনগণ হতে সওে থাকা অদূরদর্শীতার পরিচায়ক এবং এতে জনগণ তাদেও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অনবহিত থেকে যায়।

আর এভাবে ইমাম আলী (আ.) ইসলামী হুকুমতের একটি পরিপূর্ণ সংবিধান তৈরি করেন। আর একারণেই হযরত আলীর এই চিঠিটি সর্বদা সকল ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিসদের জন্য আলোচনা ও গবেষণার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। আর এ পর্যন্ত এই সংবিধানের উপর প্রচুর ব্যাখ্যা তথা তাফসীর লেখা

হয়েছে। যেখানে বর্তমান সময়ের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংবিধানের সাথে তুলনা করা হয়েছে। বহু ভাষায় এই চিঠি অনুবাদও হয়েছে। কেননা ইতিহাসে এর চেয়ে উত্তম ও উন্নত কোন সংবিধান এখনো পর্যন্ত কেউ লিখতে সক্ষময় হয় নি।

১৯। ইসলামের সর্বপ্রথম মুর্তি ধ্বংসকারী (বুতশেকান)

কাবা ঘরের ভিতরে থাকা মূতিসমূহকে সর্বপ্রথম হযরত আলী ধ্বংস করে ছিলেন। হযরত আলী (আ.) রাসূলের (সা.) কাধে উঠে কাবা ঘরের মূতিসমূহকে ভেঙ্গে ফেলেন।

হযরত আলী (আ.) দুইবার কাবা ঘরের মূর্তি ভেঙ্গে ছিলেন।

প্রথমবার: যখন হিজরতের রাতে তিনি রাসুলর বিছানায় ঘুমান। আর এই হাদিসটি নাসাঈ তার খাসায়েস গ্রন্থে, আহমাদ বিন হাম্বাল তার মুসনাদ গ্রন্থে, হাকিম নিশপুরি তার মুস্তাদরাক গ্রন্থে, মুত্তাকি হিন্দি তার কাঞ্জুল উম্মাল গ্রন্থে, খাতিব বাগদাদি তার তারিখে বাগদাদ গ্রন্থে, আবু ইয়ালি তার মুসনাদ গ্রন্থে এবং এছাড়াও আরও অনেক ঐতিহাসিক এবং মুহাদ্দিস তাদেও গ্রন্থ বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি এরূপ:

ইবনে আব্বাস থেকে বর্নিত হয়েছে যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (সা.) যখন কাবা ঘরে প্রবেশ করলেন তখণ সেখানে ৩৬০টি মূর্তি ছিল। আরবের প্রতিটি গোত্রের একটি করে মূর্তি ছিল। মনে হয় শয়তান খুব ভালভাবে মুশরিকদের উপর হুকুমত করত। রাসূল (সা.) তাঁর লাঠি দিয়ে একের পর এক মূর্তি ভাঙ্গতে লাগলেন। তিনি মূর্তি সমূহেক কখনো সামনের দিক থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিচ্ছিলেন আবার কখনো পিছন দিক থেকে। সামনে দিয়ে যখন ধাক্কা দিচ্ছিলেন সেগুলো উল্টো হয়ে পড়ে যাচ্ছিল আর যখন পিছন দিয়ে ধাক্কা দিচ্ছিলেন তখন মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছিল। রাসূল (সা.) হাত লাগানো ছাড়াই সকল মূর্তি ফেলে দিয়েছিলেন এবং এই পবিত্র আয়াতটি তিলাওয়াত করছিলেন:

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

আর ঘোষণা করে দাও, সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, মিথ্যার তো বিলুপ্ত হবারই কথা।[১]

এ আয়াততটিতে ইসলামের নবীকে উদ্দেশ্য করে এবং তাঁকে দায়িত্ব দিয়ে বলা হয়েছে, আপনি সুসংবাদ দিয়ে দিন যে সত্যের বিজয় হয়েছে আর বাতিলের

৮৩। সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ৮১।

বিলুপ্তি ঘটে গেছে।

অন্য একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সা.) প্রথমে হাজারুল আসওয়াদে চুমু খেলেন অতঃপর কাবা ঘরের তাওয়াফ করলেন এবং তাঁর হাতে একটি ধনুক ছিল। তাওয়াফ করতে করতে যখন কাবার ঘরের দরজার কাছে পৌছান সেখানে তিনি কুরাইশদেও সব থেকে বড় মূর্তি হোবাল দেখতে পান। তখন তিনি নিজের হাতে থাকা ধনুক দিয়ে ওই মূর্তির চোখে মুখে আঘাত করতে থাকেন এবং এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন:

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

আর ঘোষণা করে দাও, সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, মিথ্যার তো বিলুপ্ত হবারই কথা।

যুবাইর বিন আওয়াম আবু সুফিয়ানকে বলেন: হোবাল পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। আর তোমরা ওহুদের যুদ্ধে অহঙ্কার কো বলেছিলে যে, এই হোবাল মূর্তি তোমাদেরকে বিজয় এনে দিয়েছে।

আবু সুফিয়ান বলল: হে আওয়ামের পুত্র! তুমি আমাকে আর উপহাস ও অপমান কর না আমি বুঝতে পেরেছি। মুহাম্মাদের খোদার যদি কোন শরিক থাকত তাহলে আজকে এমন হত না। এর মধ্যে রাসূল (সা.) মাকামে ইব্রাহীরেম দিকে গেলেন এবং কাবা ঘরের নিকটবর্তী হয়ে দাড়ালেন।

রাবি বলেন: হযরত আলী (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাতের বেলা রাসূল (সা.) আমাকে নিয়ে কাবা ঘরে গেলেন। তিনি আমাকে বসতে বললেন, আমি বসার পর তিনি আমার কাধে উঠলেন এবং তাঁকে কাধে নিয়ে আমাকে উঠে দাড়াতে বললেন। আমার উঠে দাড়াতে কষ্ট হতে দেখে রাসূল (সা.) আমাকে বসতে বলে বললেন: হে আলী! তুমি আমার কাধে উঠে মূর্তি ভাঙ্গ এবং আমিও তাই করলাম।

অন্য একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা.) হযরত আলীকে বললেন: হে আলী! আমার কাধে উঠ এবং কাবা ঘরের মূর্তিসমূহকে ভেঙ্গে ফেল। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আপনি আমার কাধে উঠুন। আমি কিভাবে আপনার কাধে উঠব। তখ রাসূল (সা.) বললেন: হে আলী! তুমি নবুয়্যতের ভারকে উঠাতে (সহ্য করতে) পারবে না। এর সঠিক অর্থ হচ্ছে মহান আল্লাহ নবুয়্যতের দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন। আর সেই দায়িত্ব পালন করার দায়িত্ব আমার। সুতরাং আমার দায়িত্বের বোঝা আমাকেই পালন করতে হবে অন্য কেউ পারবে না। তোমরা আমার উত্তরাধিকারী তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আমার রেখে যাওয়া শরীয়তকে হেফাজত করা। যেভাবে রাসূল (সা.) একটি হাদিসে

হযরত আলীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন: হে আলী! তুমি আমার মতই কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে আমার পরে আর কোন নভী আসবে না। সুতরাং আস আমার কাধে সওয়ার হও। এবার রাসূল (সা.) বসলেন এবং হযরত আলী তাঁর পবিত্র কাধে উঠলেন। হযরত আলীকে কাধে নিয়ে রাসূল (সা.) উঠে দাড়ালেন এবং হযরত আলী কাবা ঘরের ছাদে উঠে গেলেন। রাসূল (সা.) পাশে সরে গেলেন তখন আমার মনে হচ্ছিল যে, আমি ইচ্ছা করলে আসমানকেও ছুতে পারব।

একটি হাদিস অনুযায়ী এক ব্যক্তি রাসূলকে (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন: হে আলী! আপনি যখন রাসূলের (সা.) কাধে সওয়ার হয়েছিলেন তখন আপনার অনুভূতি কেমন ছিল?

হযরত আলী (আ.) উত্তর দিলেন: আমি নিজেকে এতটাই উচ্চে অবস্থানে মনে করছিলাম যে, মনে হচ্ছিল সবচেয়ে দূরতম তারা সুরাইয়্যাকে নিজের হাতে ছুতে পারব।

যখন হযরত আলী মহানভীর কাধে উঠে ছিলেন তখন রাসূল (সা.) বলেন: হে আলী! সব থেকে বড় মূর্তিটাকে ভেঙ্গে ফেল। আর ওই মূর্তিটি তামা অথবা শিশা দিয়ে তৈরি করা ছিল।

অন্য একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, সকল মূর্তি ভেঙ্গে ফেলার পর খোজায়া গোত্রের মূর্তিটি অবশিষ্ট ছিল। এই মূর্তিটাকে খোজায় গোত্রের লোকেরা লোহার কিলকের মাধ্যমে শক্ত ও মজবুত করে স্থাপন করেছিল। রাসূল (সা.) বললেন: হে আলী! এই মূর্তিটার কিলকগুলো বের করে তারপর সেটাকে উৎপাটন কর। আমি কিলক তথা পেরেকসমূহ খলছিলাম আর রাসূল (সা.) অনবরত এই াঅয়াতটি তিলাওয়াত করছিলেন।

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

আর ঘোষণা করে দাও, সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, মিথ্যার তো বিলুপ্ত হবারই কথা।

এভাবে সবগুলো কিলক বের করা হলে মূর্তিটি মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

হালাবি বলেন: হাদিস থেকে এটা বোঝা যায় যে, এটা হোবাল ছাড়া অন্য কোন মূর্তি ছিল। হোবাল কুরাইশদের সব থেকে বড় মূর্তি ছিল না। বরং এটা অন্য কোন মূর্তি যেটা হোবাল থেকে বড় ছিল। কিন্তু ইতিহাসে এই মূর্তিটার নাম উল্লেখ করা হয় নি।

তবে সবশেষে যে মূর্তিটি ভাঙ্গা হয়েছিল সেটা হোবালই ছিল। আর এই বিষয়টি যুবাইর এবং আবু সুফিয়ানের কথোপকথোন থেকে স্পষ্ট হয়ে যয়।

যুবাইর বিন আওয়াম যখন আবু সুফিয়ানকে বলেন: হোবাল পড়ে ধ্বংস হয়ে

গেছে। আর তোমরা ওহুদের যুদ্ধে অহঙ্কার করে বলেছিলে যে, এই হোবাল মূর্তি তোমাদেরকে বিজয় এনে দিয়েছে। তখন আবু সুফিয়ান বলল: হে আওয়ামের পুত্র! তুমি আমাকে আর উপহাস ও অপমান কর না আমি বুঝতে পেরেছি। মুহাম্মাদের খোদার যদি কোন শরিক থাকত তাহলে আজকে পরিস্থিতি এমন হত না বরং অন্য কিছু হত।

তাফসীরে কাশশাফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আলী (আ.) সকল মূর্তি ধ্বংস করে দিয়েছিলেন এবং শুধুমাত্র কাবার ছাদের উপর খোজায়া গোত্রের মূর্তিটি অবশিষ্ট ছিল। আর ওই মূর্তিটি শিয়া অথবা তামা দিয়ে নির্মিত ছিল। রাসূল (সা.) বললেন: হে আলী! ওটাও ভেঙ্গে ফেল। এবার রাসূল (সা.) হযরত আলীকে নিজের কাধে তুলে নিলেন এবং হযরত আলী কাবা ঘরের ছাদে উঠে ওই মূর্তিটিও ভেঙ্গে দিলেন। এটা দেখে মক্কাবাসীরা অবাক হয়ে গেল এবং বলতে লাগল: মুহাম্মাদ আসলেই অনেক বড় একজন জাদুগার।

খাসায়েসে আশারা গ্রন্থে কাশশাফ গ্রন্থের লেখক আরও একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত আলী (আ.) বলেছেন: মূর্তি ভেঙ্গে কাবা ঘরের ছাদ থেকে নেমে রাসূলের (সা.) সাথে যেতে যেতে আমার মনে ভয় হচ্ছিল যে, কুরাইশরা যেন আমাকে দেখে না ফেলে। এটা থেকে বোঝা যায় যে, ঘটনাটি মক্কা বিজয়ের দিনের নয়। আর এই বিষয়টি অবশ্যই চিন্তা করার মত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

দ্বিতীয় বার: হযরত আলী (আ.) দ্বিতীয়বার মক্কা বিজয়ের পর কাবা ঘরের মূর্তি ভেঙ্গে ছিলেন। তাফসীরে কাশশাফ গ্রন্থে যামাখশারি লিখেছেন যে, কাবা ঘরের চারপাশে ৩৬০ টি মূর্তি ছিল। আর প্রতিটি গোত্রের আলাদা ও বিশেষ মূর্তি ছিল।

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আরবের প্রতিটি গোত্রের একটি করে মূর্তি ছিল এবং তারা সেটার তাওয়াফ করত এবং তার সামেন সিজদা করত। কাবা ঘর আল্লাহর কাছে নালিশ করে বলল: হে আল্লাহ! আর কত দিন তোমার ঘরের চারপাশে তোমাকে বাদ দিয়ে এই সকল মূর্তির উপাসনা চলবে? আল্লাহ কাবা ঘরকে উদ্দেশ্য করে বললেন: অচিরেই আমি এই পরিস্থিতি পাল্টে দিব এবং তোমার চারপাশে ধুশুমাত্র আমার জন্য সিজদা এবং আমার উপাসনা করার লোকে পরিপূর্ণ করে দিব। আর যেভাবে পাখি অতি যত্নের সাথে তার ডিমের হিফাজত করে তোমাকেও অতি যত্নে বুকে টেনে নিবে এবং হিফাজত করবে। আর চারিদিক শুধু তাকবির ধ্বণী উচ্চারিত হতে থাকবে।

এবার রাসূল (সা.) কাবা ঘরে প্রবেশ করলেন এবং বেলালকে বললেন, ওসমান

বিন আবি তালহার কাছ থেকে কাবা ঘরের চাবি নিয়ে আস।[১]

অসংখ্য দলিল প্রমাণ এবং সনদ থেকে প্রমাণিত যে, রাসূল (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন হযরত আলীকে অতি মহান ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছিলেন। রাসূল (সা.) হযতর আলীকে নিজের কাধে তুলে নিলেন এবং হযতর আলী কাবা ঘরের ছাদে উঠে এমনভাবে মূর্তি ভেঙ্গে ছিলেন যে, কাবা ঘরের দেয়াল দুলছিল।

আহমাদ বিন হাম্বাল, আবু ইয়ালি মুসেলি তাদের স্বীয় মুসনাদে, আবু বাকর খাতিব বাগদাদি তার তারিখে বাগদাদ গ্রন্থে, মুহাম্মাদ বিন সাবাহ যাফেরানি স্বীয় ফাযায়েল গ্রন্থে এবং খাতিব খারাজমি তার আরবিয়ান গ্রন্থে এই হাদিস বর্ণনা করেছেন।

আবু আব্দুল্লাহ নাতানযি তার খাসায়েস গ্রন্থে এবং ইমাম রেজার খাদেম আবুল মাযাসেবিহ বলেন যে, আমি শুনেছি যে, ইমাম রেজা (আ.) তাঁর পিতার থেকে এবং তিনি তার পিতামহদের থেকে এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন:

ورفعناه مكانا عليا

এবং আমরা তাকে একটি উচ্চস্থানে উঠিয়ে ছিলাম (আমরা তাকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছি)।[২]

এই আয়াত তখন অবতীর্ণ হয় যখন হযরত আলী (আ.) মূর্তি ভাঙ্গার জন্য রাসূলের (সা.) কাধে উঠেছিলেন।[৩]

কাতাদাহ ইবনে মুসাইয়্যাব থেকে এবং তিনি আবু হুরাইরা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আমার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলের (সা.) সাথে আমরা যখন মক্কায় প্রবেশ করলাম তখন কাবা ঘরে ৩৬০টি মূর্তি ছিল। আর জনগণ আল্লাহকে বাদ দিয়ে সেই মূর্তিসমূহের জন্য সিজদা ও ইবাদত করত। রাসূলের (সা.) নির্দেশে সকল মূতিসমূহকে ভেঙ্গে ফেলা হয়। আর কাবা ঘরের ছাদের উপর সব থেকে বড় একটি মূর্তি ছিল যার নাম ছিল হোবাল। রাসূল (সা.) হযরত আলীকে বললেন: হে আলী! এই মূর্তি ভাঙ্গার জন্য তুমি কি আমার কাধে সওয়ার হবে নাকি আমি তোমার কাধে উঠে ছাদ থেকে এই মূর্তি ভেঙ্গে ফেলব?

হযরত আলী (আ.) বললেন: হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আপনি আমার কাধে সওয়ার হোন। রাসূল (সা.) যখন আমার কাধে উঠলেন তখন আমার কাছে

৮৪। সিরাতুন নাবাভী, ইবনে হিশাম, খণ্ড ৩ পৃ: ১২৩ ।

৮৫। সূরা মারিয়াম, অঅয়াত: ৫৭।

৮৬। মানাকিব ইবনে শাহরে আশুব, খণ্ড ২, পৃ: ১৫৪।

নবুয়্যতের বোঝাকে অকে ভারী মনে হল। তখন আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমি আপনার কাধে উঠে ছাদে গিয়ে মূর্তি ভেঙ্গে ফেলি। রাসূল (সা.) মুচকি হেসে বসে পড়লেন এবং আমি তাঁর কাধে সওয়ার হলাম। আল্লাহর কসম! যিনি সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা আমি তখন এমন অনুভব করছিলাম যে, আমি ইচ্ছা করলে আকাশ ছুতে পারব। আর আমি যখন কাবা ঘরের ছাদের উপর থেকে হোবাল মূর্তিকে ভেঙ্গে ফেললাম তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল:

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

আর ঘোষণা করে দাও, সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, মিথ্যার তো বিলুপ্ত হবারই কথা।

এভাবে কাবা ঘর মূর্তি থেকে মুক্ত হল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) পবিত্র কাবা ঘরে প্রবেশ করলেন এবং দুই রাকাত নামাজ আদায় করলেন।[১]

যদিও দুটি হাদিসের মধ্যে শাবাহাত তথা মিল আছে তাই দুটি হাদিস একটি বিষয়ের উপর ইঙ্গিত করছে আর তা হল, হযতর আলী (আ.) দুইবার রাসূলের (সা.) পিঠে সওয়ার হয়েছেন এবং কাবা ঘরের ছাদের উপর থেকে মূর্তি ভেঙ্গে ফেলে জাহেলিয়ারেত যুগের অবসান ঘটিয়ে ইসলামের আলো এবং উচ্চমর্যাদাকে তুলে ধরেছেন।

২০। সর্বপ্রথম কাবা ঘরে জন্ম এবং মসজিদে শাহাদাত প্রাপ্ত হওয়ার মর্যাদার অধিকারী

সর্বপ্রথম যিনি কাবা ঘরে যার জন্মগস্থহণ করেছেন এবং সর্বপ্রথম যিনি মসজিদে শাহাদাত বরণ করেছেন তিনি হলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব। আর এভাবে হযরত আলীই একমাত্র ব্যক্তি যার জীবনের সূচনা এবং শেষ মসজিদেই হয়েছে।

হযরত আলী (আ.) ১৩ই রজব শুক্রবার কাবা ঘরে জন্মগ্রহণ করেন এবং জন্মের পরপরই সিজদায় গিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। আবার ঠিক শুক্রবারের দিনই মসজিদে নামাজরত অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেন। আর এটা এমন একটি মহান ফজিলত যা না তার পূর্বে কারও ভাগ্যে ছিল আর না তাঁর পরে কারও ভাগ্যে হয়েছে।

প্রসিদ্ধ লেখক আব্বাস মাহমুদ আক্কাদ লিখেছেন: হযরত আলী (আ.) নিজের

৮৭। আবকারিয়াতু ইমাম আলী, আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ, পৃ: ১৫৫।

কপালে শাহাদাত লিখে দুনিয়াতে এসেছিলেন এবং দুনিয়া ছেড়ে যখন গেছেন সেটাও ছিল তলোয়ারের আঘাত প্রাপ্ত হয়ে শাহাদাত বরণ করা। পৃথিবীর কোন শিল্পি এবং মুজাহিদ তার চেহারাকে ভুলাতে পারবে না। কেননা তিনি আল্লাহর পথের এমন এক মুজাহিদ যিনি তার হাত, পুরো অসিস্ত এবং প্রাণপনে আল্লাহর পথে জিহাদ করে শাহাদাত বরণ করেছেন।

তিনি আরও লিখেছেন: ইতিহাসে এমন কোন ব্যক্তি নেই যার জন্ম কাবা ঘরে হয়েছে এবং শাহাদাত হয়েছে মসজিদে। পৃথিবীতে এমন কেউ কি আছে যার শুরু এবং শেষ হযরত আলীর শুরু এবং শেষের মত হয়েছে।

সুতরাং হযরত আলীর (আ.) গোটা জীবন ইসলামের পথে অতিবাহিত হয়েছে। আর পুরো জীবনকে ইসলামের খেদমত, ইসলামী আকিদার হেফাজত এবং ইসলামের স্তম্ভকে দৃঢ় করার জন্য ব্যয় করেছেন। নিজের সমস্ত দামী ও গুরুত্বপূর্ণ জিনিসকে আল্লাহর কলেমার প্রচার প্রসারের জন্য এবং কাফিরদের ধ্বংস করার জন্য আল্লাহর পথে ব্যয় করেছেন।

আর এটাই হয়েছে। কেননা রাসূলের (সা.) অশেষ ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা এবং ত্যাগ। আর তাঁর একনিষ্ঠ সাহাবাদের চেষ্টা যার প্রথমেই রয়েছে আমিরুল মুমিনিন হযরত আলীর আপ্রাণ প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠত হয়েছে এবং কুফর ও জাহেলিয়াত ধ্বংস হয়েছে।

শেষ কথা

হযরত আলীর (আ.) ফজিলত ও মর্যাদা এবং ইসলামে তার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করার পর আমাদের উপর এটাও ফরজ হয়ে যায় যে, আমরা তার আনুগত্য ও অনুকরণ করব। আর আমাদেরকেই সকল ময়দানে অগ্রগামী হতে হবে। একজন ছাত্রকে জ্ঞানের ময়দানে, একজন শ্রমিক এবং কর্মচারীকে তার কাজের ময়দানে, একজন ব্যবসায়ীকে কর্শসংস্থান সৃষ্টিতে এবং সমাজ সেবার ময়দানে। একজন আলেমকে আখলাক ও নৈতিকতার ময়দানে। একজন যুবককে ধার্মিক জীবন-যাপন এবং সমাজে ধর্মীয় শিক্ষা ও মূল্যবোধকে হেফাজত করার মাধ্যমে। অধর ঠিক এভাবেই হযরত আলীর মহব্বতকারী এবং তার ইমামতের প্রতি বিশ্বাসীদের উপর ফরজ হচ্ছে প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা যেন অন্যন্য, দৃষ্টান্ত এবং অগ্রগামী হয়ে থাকে।

ব্যক্তিগ এবং স্বীয় জীবনে অগ্রগামী এবং সফল থাকার পাশাপাশি মুমিনদের উপর জরুরী হল তারা যেন সমাজিক ও সামষ্টিক জীবনেও সকল ক্ষেত্রে অগ্রগামী ও সফল থাকে। একদল মুমিন যদি একটি কল্যাণের ক্ষেত্রে অবদান

রাখে অন্যদলের উচিত আলাদা আরেকটি কল্যাণের ক্ষেত্রে অবদান রাখা। যদিও ভালকাজের ময়দানে অনেক সময় কিছু মুমিন পিছনে থেকে যায়। তথাপি আমাদের দায়িত্ব হল সমাজের কল্যাণ মূলক এবং সাংস্কৃতিক কাজের কেন্দ্রে অবস্থান করা এবং অগ্রগামী থাকা। যাতে আমাদের সমাজ শিল্প, সাংস্কৃতি এবং জ্ঞানের সকল ময়দানে কল্যাণ মূলক কাজে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করতে পারে।

আর এভাবে যে কোন স্থানে আমিরুল মুমিনিন হযরত আলীর আনুগত্য ও অনুকরণ করা সম্ভব। আর আমাদের উপর এটাও জরুরী যে, আমরা যেন হযরত আলীর মহব্বত ও মোয়াদ্দাতকে শুধুমাত্র নিজেদের অন্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখি। বরং আমাদেরকে তার নির্দেশিত পথে চলতে হবে এবং তাঁর আখলাক, সিরাত এবং শিক্ষার উপর আমল করতে হবে। যার উত্তম দৃষ্টান্ত হচ্ছে, ভাল এবং সৎকাজে অগ্রগামী থাকা। ভাল ও সৎকাজ করা। জ্ঞানের ময়দানে অগ্রগামী থাকা। উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া। কাজের ময়দানে উন্নতি করা। বিচক্ষণতা ও দুর্দর্শিতার সাথে কাজ করা। কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে সঠিকভাবে চিন্তা ও গবেষণা করা। কথা, কাজে, মনেপ্রাণে হযরত আলীর ইমামত, বেলায়াত এবং মহব্বত ও মোয়াদ্দাতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। কেননা এটা হচ্ছে সেই পথ যার মাধ্যমে আমাদের সমাজ হযরত আলীর (আ.) পদাঙ্ক অনুসরণ করে সত্য, ন্যায়, ইনসাফ, নেক এবং কল্যাণের পথে পরিচালিত হতে পারবে।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين– وصلى الله على سيدنا مُحَمَّد و آله الطيبين الطاهرين.

তথ্যসূত্র

১। পবিত্র কোরআন মাজিদ।

২। ইস্পাহানি, আবু বাকর আহমাদ বিন মুসা মারদুইয়া (মৃত্যু-৪১০ হিজরি), মানাকিবে আলী ইবনে আবি তালিব, দারুল হাদিস প্রকাশনী, কোম, ইরান, তৃতীয় মুদ্রন ১৪২৯ হিজরি।

৩। আল আমিন, সাইয়্যেদ মোহসেন (মৃত্যু-১৩৭১ হিজরি), আইয়ানুশ শিয়া, দারুল মায়ারেফ প্রকাশনী, বৈরুত, লেবানন, ১৪১৮ হিজরি।

৪। ইবনুল আছির, আবুল হাসান আলী ইবনে আবুল কারাম মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল কারিম বিন আব্দুল ওয়াহেদ শাইবানি (মৃত্যু-৬৩০ হিজরি), আল কামিল ফিত তারিখ, দারল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, ১৪২৪ হিজরি।

৫। ইবনুল আছির, আবুল হাসান আলী ইবনে আবুল কারাম মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল কারিম বিন আব্দুল ওয়াহেদ শাইবানি (মৃত্যু-৬৩০ হিজরি), উসদুল গাব্বাহ ফি মারেফাতেস সাহাবা, দারল কুতুব আল আরাবি, বৈরুত, লেবানন।

৬। ইবনে হাজার, আহমাদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আসকালানি, লিসানুল মিযান, আলামি প্রকাশনি, বৈরুত, লেবানন, ১৩৯০ হিজরি।

৭। ইবনে সাদ, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন সাদ বিন মানি আল বাসরি আল বাগদাদি (মৃত্যু-২৩০ হিজরি), তাবাকাতুল কুবরা, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, ১৪১০ হিজরি।

৮। ইবনে সাইয়্যেদুন নাস, মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল ইয়ামোরি আর রাবিয়ী (মৃত্যু-৭৩৪ হিজরি), উয়ুনুল আসার ফি ফুনুনিল মাগাযি ওয়াশ শামায়েল ওয়াস সেইর, ইযযুদ্দীন, বৈরুত, লেবানন, ১৪০৯ হিজরি।

৯। ইবনে শোবা আল হাররানি, আবু মুহাম্মাদ হাসান বিন আলী বিন হুসাইন, তোহাফুল উকুল আন আলে রাসূল আলামি প্রকাশনি, বৈরুত, লেবানন ১৩৯৪ হিজরি।

১০। ইবনে শাহরে আশুব, আবু জাফর মোহাম্মাদ বিন আলী আস সারভি আল মাযানদারানি (মৃত্যু-৫৮৮ হিজরি), মানাকিবে আলে আবু তালিব, দারুল আযওয়া, বৈরুত, লেবানন, ১২১৪ হিজরি।

১১। ইবনে তাউস, আবুল কাসেম আলী ইবনে মুসা ইবনে জাফর ইবনে মুহাম্মাদ আল হাসানি, দারুল কিতাব, কোম, ইরান, ১৪১৩ হিজরি।

১২। ইবনে আসাকির, আলী ইবনে হুসাইন ইবনে, হেবাতুল্লাহ দামেশকি (মৃত্যু-৫৭৩ হিজরি), তারিখে দামেশক, দারুত তায়ারুফ, বৈরুত, লেবানন, ১৯৭০ খ্রি.।

১৩। ইবনে কাছির, আবুল ফিদা হাফিজ ইবনে কাছির দামেশকি, আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, আল আসরিয়া প্রকাশিনি, বৈরুত, লেবানন, ১৪২৬ হিজরি।

১৪। ইবনে হিশাম, আবু মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক ইবনে হিশাম আল মায়াফেরি,

আল আসরিয়া প্রকাশিনি, বৈরুত, লেবানন, ১৪৩৩ হিজরি।

১৫। আল বাহরানি, আবুল মাকারেম হাশেম বিন সুলাইমান বিন ইসমাইল আল কাতকানি আত তুবালানি (মৃত্যু-১১০৭ হিজরি), গায়াতুল মারাম ওয়া হুজ্জাতুল খিসাস ফি তাইনেল ইমাম মিন তারিকেল খাস ওয়াল আম।

১৬। আত তামিমি আল মাগরেবি, আবু হানিফা নোমান বিন মোহাম্মাদ বিন মানসুর বিন আহমাদ (মৃত্যু-৩৬৩ হিজরি), শারহুল আখবার, নাশরে ইসলামী কোম, ইরান।

১৭। আত তামিমি আল মাগরেবি, আবু হানিফা নোমান বিন মোহাম্মাদ বিন মানসুর বিন আহমাদ (মৃত্যু-৩৬৩ হিজরি), আল মানকিব ওয়াল মাছালিব, আল আলামি প্রকাশনী, বৈরুত, লেবানন, ১৪২৩ হিজির।

১৮। আল হালাবি শাফেয়ী, আবুল ফারাজ নুরুদ্দিন আলী ইবনে ইব্রাহীম ইবনে আহমাদ (মৃত্যু-১০৪৪ হিজরি), সিরাতুল হালাবিয়া, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, ২০০৮ খ্রি.।

১৯। আল খারাজমি, আল মোয়াফ্ফাক বিন আহমাদ বিন মোহাম্মাদ আল মাক্কি (মৃত্যু-৫৬৮ হিজরি), আল মানাকিব, নাশরে ইসলামী, কোম, ইরান, ১৪২৫।

২০। আর রাজি শারিফ, নাহজুল বালাগা, বৈরুত, লেবানন, ১৪০৯ হিজরি।

২১। সালেহি শামি, মোহাম্মাদ বিন ইফসুফ, সোবোলুল হুদা ফি সিরাতে খাইরিল ইবাদ, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, ১৪১৪ হিজরি।

২২। সাদুক, আবু জাফর মুহাম্মাব ইবনে আলী ইবনিল হুসাইন বিন বাবেভেই কোমি (মৃত্যু-৩৮১ হিজরি), আত তাওহীদ, বৈরুত, লেবানন।

২৩। আত তাবারি, আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারির (মৃত্যু-৩১০ হিজরি), তারিখে তাবারি, তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, ১৪২৪ হিজরি।

২৪। তুসি, আবু জাফর মোহাম্মাদ বিন হাসান বিন আলী (মৃত্যু-৪৬০ হিজরি), আল আমালি, তারিখুল আরাবি প্রকাশনী, বৈরুত, লেবানন, ১৪৩০ হিজরি।

২৫। আল আমেলি জাফার মোরতাজা, আস সাহীহ মিন সিরাতেন নাবি আল আযাম, মারকাযে ইসলামী লিদদারাসাত, বৈরুত, লেবানন, ১৪২৮ হিজরি।

২৬। আল আক্কাদ, আব্বাস মাহমুদ, আবকারিয়াতুল ইমাম আলী, দারুল কুতুব

আল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, ১৪১১ হিজরি।

২৭। আল ফাজলি, আব্দুল হাদি, খোলাসাতু ইলমে কালাম, মারকাযে গাদীর লিদদারাসাত, বৈরুত, লেবানন, ১৪২৮ হিজরি।

২৮। কান্দুজি আল হানাফি, সুলাইমান বিন ইব্রাহীম হুসাইনি বালখি, ইয়ানাবিউল মাওয়াদ্দাহ, মোয়াসসাসা আলামী লিল মাতবুয়াত, বৈরুত, লেবানন, ১৪১৮ হিজরি।

২৯। আল কুলাইন, মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব (মৃত্যু-৩২৯ হিজরি), উসুলে কাফি, দারুত তায়ারোফ লিল মাতবুয়াত, বৈরুত, লেবানন, ১৪১৯ হিজরি।

৩০। আল মাজলিসি, মুহাম্মাদ বাকের বিন মুহাম্মাদ তাকি, বিহারুল আনওয়ার, মোয়াসসাসা আহলে বাইত, বৈরুত, লেবানন, ১৪০৯ হিজরি।

৩১। আল মুরতাজা, আলী ইবনেল হুসাইন আল মুসাভি আল আলাভি (মৃত্যু-৪৩৬ হিজরি), আমালি মোরতাজা: গুরারুল ফাওয়ায়েদ ওয়া দুরুরুল কালায়েদ, আল আসরিয়া প্রকাশনী, বৈরুত, লেবানন, ১৪২৫ হিজরি।

৩২। মারআশি নাজাফি, সাইয়্যেদ শাহাবুদ্দিন (মৃত্যু-১৪১১ হিজরি), শারহে এহকাকুল হাক, আয়াতুল্লাহ মারআশি লাইব্রেরী, কোম, ইরান, ১৪১৫ হিজরি।

৩৩। মুফিদ, আবু আব্দুল্লাহ, মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন নোমান আল আকবারি আল বাগদাদি (মৃত্যু-৪১৩ হিজরি), আল ইরশাদ, তারিখে তারাবি প্রকাশনী, বৈরুত, লেবানন।

৩৪। নাসাঈ, আবু আব্দুর রহমান আহমাদ বিন শোয়াইব (মৃত্যু-৩০৩ হিজরি), খাসায়েসে আমিরুল মুমিনিন আলী ইবনে আবি তালিব, আল আসরিয়া প্রকাশনী, বৈরুত, লেবানন, ১৪২৪ হিজরি।

৩৫। মুত্তাকি হিন্দি, আলাউদ্দিন আলী আলমুত্তাকি বিন হিসামুদ্দিন, কাঞ্জুল উম্মাল ফি সুনানেল আকওয়াল ওয়াল আফওয়াল, সেরালাত প্রকাশনি, বৈরুত, লেবানন, ১৪০৯ হিজরি।

بیست دلیل برتری حضرت علی (ع)

হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন
শেইখ ড. আব্দুল্লাহ আহমাদ আল ইউসুফ

হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন
আল-হাজ্ব মাওলানা মো. আলী মোর্ত্তজা